প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার,
ডি. এম. লাইব্রেরী,
৪২ নং বিধান সরণী,
কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সর,
কলিকাতা-৬

সূচী

গৌরকিশোর ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

ভূমিকা

সমস্যাগুলো আমাদের মনের ভিতরই। সমাধানও তেমনি আমাদের মনের ভিতরে। মনঃস্থির করতে না পারলে আমরা একবার এপথ ধরব, একবার ওপথ ধরব, তারপর আবার এপথ, আবার ওপথ। শেষে একটা মধ্যপথও পেতে পারি। কিংবা তৃতীয় এক পথ। ভবিষ্যৎই বলতে পারে ভারত কোন পথে তার লক্ষ্যে উপনীত হবে। লক্ষ্যটাই যে কী তাও তো পরিষ্কার নয়। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সকলেই একমত ছিলেন যে স্বাধীনতাই লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কী? মার্কিন মার্কা গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র? ব্রিটিশ মার্কা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র? রুশ মার্কা শিল্পভিত্তিক অগণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র? না রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, যার গুরু গান্ধী?

ইণ্টেলেকচুয়াল বলে যাঁদের পরিচয় তাঁরা রথী নন, পলিটিসিয়ানরাই রথী। রথীরা যদি সারথির অভাব বোধ করেন তবে ইণ্টেলেকচুয়ালরা সারথির স্থান নিতে পারেন। কিন্তু সাধারণত তাঁরা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করেন না, যদি-বা করেন তবে এমনভাবে রদবদল করেন যে বুদ্ধিজীবীরা অপদস্থ হন। শেষের দিকে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ যেমন হয়েছিলেন। জবাহরলালেরই মতি স্থির ছিল না। থাকত কী করে? ধনতন্ত্রের গায়ে হাত দেবার মতো সাহস তাঁর অল্পই ছিল। স্বদেশী বণিকদের সাহস তাঁর চেয়েও বেশী! ওঁদের পেছনে বিদেশী বণিক। স্বদেশী রাজনীতিকরাও ওঁদের আশেপাশে।

গায়ে পড়ে কাউকে পরামর্শ দেবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। অথচ নীরব দর্শক হয়ে কেবলমাত্র মনন লিখন রূপসৃষ্টি রসসৃষ্টি প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপৃত থাকাও অস্বস্তিকর। আমার হাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাজও আছে, আমার হাত খালি নয়। তা সত্ত্বেও আমাকে বিবাদ বিসম্বাদেরও সময় মুখ খুলতে হয়। বিশেষতঃ যখন দেখি দেশ লক্ষ্যহীনভাবে হিংসা প্রতিহিংসার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার অন্তরের শান্তির জন্যেও আমাকে কিছু বলতে হয়। তাতে যদি বাইরেও শান্তি হয় তো উত্তম। না হয় তো একজন বুদ্ধিজীবীর দৌড় ওই পর্যন্তই।

দেশের স্বাধীনতা যখন সর্বসম্মত লক্ষ্য ছিল তখন আমিও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বার বার তিনবার। কিন্তু কোনবারেই অন্তরাত্মার সম্মতি পাইনি। গঠনকর্মেই নিযুক্ত থেকেছি, ভাঙনের কাজ করিনি। স্বাধীনতালাভের পর আর সে সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা ওঠে না। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলে দলভুক্ত হতে হয়। দলের লোক হলে আমি নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতুম। সতর্ক থেকেছি যাতে রাজনীতির পাকে জড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা না হারাই। জাতির স্বাধীনতার মতো ব্যক্তির স্বাধীনতাও মহামূল্য। যার সে স্বাধীনতা নেই সেই জাতি যেমন বিশ্বসভায় অপাঙ্‌ক্তেয়, সেই ব্যক্তিও তেমনি বুদ্ধিজীবী মহলে মর্যাদাহীন। তার কণ্ঠস্বর তার দলের কর্ণকুহরের বাইরে যায় না। আমি কেন সেইটুকুতে সন্তুষ্ট হব? এত কষ্ট করে যা ভাবছি আর লিখছি তা কেন সর্বত্রগামী হবে না?

রোজ পাঁচখানা দৈনিকপত্র আমার পাঠ্য। এছাড়া দেশবিদেশের সাপ্তাহিক। না পড়ে আমি কিছু ভাবিনে। না ভেবে আমি কিছু লিখিনে। যা লিখি তা ভাববার মতো করেই লিখি। যাঁরা পড়বেন তাঁরাও ভাববেন এটাই আমি আশা করি। আর কিছু না পারি একদল পাঠককে ভাবুক করে তুলতে পারি। দেশময় যদি একটা ভাবনার স্রোত বয়ে যায় তো বহু সমস্যার সমাধান সুগম হয়। না হলেও আমাদের ভাবনা বৃথা যাবে না। ভাবনাই তো কর্মের বীজ। বীজধান তোলা থাকবে, পরে একদিন তার থেকে গাছ গজাবে। মিশরের জমিতে দুহাজার বছর আগে যে বীজ নিহিত ছিল এই শতাব্দীতে তাকে উদ্ধার করার পর মাটিতে বুনে ফসল পাওয়া গেছে।

বুদ্ধিজীবীরা হাতে হাতে ফল ফলাতে পারেন না। তাঁরা যাদুকর নন। এর থেকে যদি কারো ধারণা জন্মায় যে এই মুহূর্তে ভাবনার বা মননের বা ধ্যানের কোনো ভূমিকা নেই তবে সে ধারণা ভুল। আমাদের কর্তব্য ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না করে ঠিকমতো ভাবা ও ঠিকমত প্রকাশ করা। সত্য আর অহিংসার মতো অপ্রমাদও হবে আমাদের সাধনার অঙ্গ। যে নিজে অপ্রমত্ত নয় সে অপরের প্রমাদ দূর করতে পারে না। বরং মৌন থাকাও ভালো, তবু এমন কিছু বলা উচিত নয় যা প্রমাদের উপর প্রমাদ চাপায়। আমি চুপ করে থাকি কেন, এই তার উত্তর।

তা ছাড়া এটাও তো লক্ষ করা গেল বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলতে চাইলেও, দশজনের দিক থেকে সে রকম প্রত্যাশা থাকলেও, সরকার মুখ খুলতে দেবেন

না, সেনসরকে দিয়ে কণ্ঠরোধ করাবেন। এমনও দেখা গেল যে সম্পাদকের একটা ঘরোয়া সেনসরশিপ আছে, তাঁর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হলে তিনি প্রকাশ করবেন না। পাছে কেউ মনে করে যে লেখকের মতটা সম্পাদকের মত। যে দেশে অসংখ্য পত্রিকা আছে সেদেশে তুমি একজায়গায় পাত্তা না পেলে আরেক জায়গায় আদর পেতে পারো, কিন্তু এদেশে বহুল প্রচারিত পত্রিকার সংখ্যা এঁকেই তো কম, তার উপর তুমি বাংলাভাষার লেখক হয়ে থাকলে তোমার যাবার জায়গা দুটি কি তিনটি। সম্পাদকদের পরস্পরের সঙ্গে মনের মিল না থাকলেও যেখানে লেশমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা সেখানে তাঁরা একদিল। কেউ কোনো ঝুঁকি নেবেন না। আচার্য সুনীতি-কুমার একবার আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন, চাচা, আপনা বাঁচা, এটাই এদেশের নিয়ম।

দেশটা যদি গণতন্ত্রের নাম মুখে না আনত তা হলে আমি এই বলে আমার মতো বুদ্ধিজীবীদের সান্ত্বনা দিতুম যে, সকলের জন্যে যে নিয়ম তোমাদের জন্যেও সেই নিয়ম। বুদ্ধিজীবী বলে তোমরা কি দেশাচারের উর্ধ্বে? যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। কিন্তু কথায় কথায় আমরা গণতন্ত্রের নাম করি। যিনি এমারজেন্সী ঘোষণা করেন তিনি কাউকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই বলেন তিনি গণতন্ত্রের বিধান অনুসারেই উক্ত কর্ম করেছেন। এদেশে গণতন্ত্র কোনদিনই আইনত খারিজ হয়নি, কাগজপত্রে ও জিনিস বলবৎ ছিল। এমারজেন্সী সত্বেও। অথচ আমরা যখনি আমাদের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশ করতে গেছি তখনি বাধা পেয়েছি। মতটা বেআইনী বলে নয়, মতটা ভিন্ন মত বলে। বিরুদ্ধ মত বলে। এত বড়ো একটা দেশে কেবল একটাই মত থাকবে। আর সেইটেই নাকি অভ্রান্ত মত। বড়ো বড়ো সংবাদপত্রও একই সুরে গাইবে। নয়তো তাদের নিজেদেরই বিপদ।

যেদিকেই তাকাই না কেন ক্ষমতা হয়েছে কেন্দ্রীভূত। যদিও একই হস্তে নয়। গণতন্ত্র বলতে কি এই বোঝায় যে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে, যদিও একই কেন্দ্রে নয়? বুদ্ধিজীবীরা তাহলে কী করে লোকের প্রত্যাশা পূরণ করবেন, লোকে যখন জানতে চাইবে তাঁদের স্বাধীন মতামত? আমাদের বরাত ভালো যে জনগণের ভোটে এমারজেন্সী জমানা হটে গেছে। ছোটখাটো পত্রিকা নির্ভয়ে আমাদের আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেয়। কোথাও না কোথাও মুখ খুলতে পারা যায়।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

॥ এক ॥

মানবমাত্রেরই দুটি মৌল অধিকার আছে। একটি তো তার বাঁচবার অধিকার। আর একটি তার বংশরক্ষার অধিকার। এটা শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক বা সাংস্কৃতিক অর্থেও বটে। রবীন্দ্রনাথের বংশ রবীন্দ্ররচনাবলী তথা বিশ্বভারতী তথা অশেষ কীর্তি, যা জীবিত থেকে তাঁকে জীবিত রাখবে, তাঁর বাণীকে জীবিত রাখবে। তেমনি মহাত্মার বংশ তাঁর গ্রন্থমালা, তাঁর আশ্রম, তাঁর বিবিধ প্রতিষ্ঠান, তাঁর অগণিত স্মৃতিচিহ্ন। এ সকলের মধ্যে তিনি জীবিত আছেন, কেউ যদি ধ্বংস না করে তবে জীবিত থাকবেন। যে-কোনো মহাপুরুষের বেলাই একথা খাটে। এমন কি সাধারণ মানুষের বেলাও একথা সত্য। বাঁচবার অধিকার তথা বংশরক্ষার অধিকার সার্বজনীন অধিকার। এ দুটি অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না।

বাইশ বছর আগে মহাত্মা গান্ধীর বাঁচবার অধিকার হরণ করে একদল পিতৃহন্তা যে অমানুষিক অপরাধ করেছিল আর-একদল পিতামহহন্তা এখন তারই পরিসমাপ্তি ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। সুযোগ পেলে এরা মূর্তিভঙ্গও করবে। মহাত্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি যে অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল সে অর্থে আরো হাজার হাজার মুনি ঋষি জ্ঞানী গুণী কবি চিত্রকর প্রভৃতিও প্রতিক্রিয়াশীল। এইরূপ হাজার হাজার জনের জীবননাশ ও বংশনাশ করলে সংস্কৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অন্ধকারযুগ নেমে আসবে।

সাম্যবাদীরাও মানবিকবাদী। তাঁরা মানবের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই তার ঐতিহাসিক মূল্য দেবার জন্যে অবিকৃতভাবে রেখে দেন। টলস্টয় বা চেকভের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া অতি যত্নের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকটি উক্তি রক্ষা করছে। কমিউনিস্ট চীনদেশ তার কনফুশীয় তথা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের থেকে বহুদূরে সরে এলেও অতীতের বিলোপ ঘটায়নি। এত বড়ো গুরুতর

অপরাধ আর কোনো দেশের সাম্যবাদীরা করেননি। করেছে একমাত্র ফ্যাসিস্টরা। সাম্যবাদী বলে যারা পরিচয় দিচ্ছে তাদের কার্যকলাপ কিন্তু ফ্যাসিস্টদের মতো। মানবিকবাদী হলে এরা অমন কাজ করত না।

জার্মান কবি হাইনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আজ যারা বইপত্র পোড়াচ্ছে একদিন তারা মানুষকেও পোড়াবে। হিটলারী আমলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে পুরে যেভাবে মারা হলো সেটাও একপ্রকার পোড়ানো। সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে এদেশের লোকের। বইপত্র পোড়ানো কেবল সম্পত্তিনাশ নয়। এ হচ্ছে প্রাণনাশের আদিপর্ব। লেখা হচ্ছে লেখকের রক্ত। লেখা ধ্বংস করা হচ্ছে রক্তপাত করা। আমরা যারা লিখি তারা এই রক্তপাত সহ্য করতে পারিনে। এর নিন্দা করা উচিত। এতে বাধা দেওয়া উচিত। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করা উচিত।

। দুই ।

আমাদের মনীষীদের কারো মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, কারো মূর্তির মুখে আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। কারো প্রতিকৃতি পোড়ানো হচ্ছে, কারো বই পোড়ানো হচ্ছে। কোথাও কেউ প্রতিরোধ করতে সাহস পাচ্ছে না। যদি বোমা পড়ে। এমন কী, প্রতিবাদ করতেও লোকে ভয় পায়। চাচা, আপনা বাঁচা।

দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ একবার ধ্বংস হলে পরে আর পুনরুদ্ধার হয় না। একখানার জায়গায় আর-একখানা ছবি আঁকিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই ছবিখানা তো নয়। তেমনি একটি মূর্তির জায়গায় আর-একটি মূর্তি গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই মূর্তি তো নয়। সেই বই অবশ্য আবার ছাপিয়ে নেওয়া যায়, যদি একটিও কপি আস্ত থাকে। কিন্তু সেই সংস্করণ তো নয়। প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক কর্মের বা কীর্তির মধ্যে একটি অপূরণীয়তা আছে। সেটা আছে বলেই সেটার মূল্য এত বেশী।

যাদের মূল্যবোধ বিকৃত বা অসাড় তারা ধ্বংসের কাজটাই করে দিয়ে যায়। সৃষ্টির দায় নেয় না। সে ক্ষমতা বা সে প্রতিভাই নেই। সব কিছুই তাদের কাছে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকাশ। আর বুর্জোয়া সংস্কৃতি হলেই তা একদম পচা,

একেবারেই প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রমিকের কাছে তা হারাম, কৃষকের কাছে তা গোমাংস।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ এঁরা এমন কী অপরাধ করেছিলেন যে এঁরা অবমাননার যোগ্য হবেন? এদের কীর্তিলোপ বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশলোপ করা হবে? প্রাণরক্ষার প্রশ্ন এদের বেলা ওঠে না কারণ এঁরা এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কীর্তিরক্ষা বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশ-রক্ষার প্রশ্ন কি উঠিবে না? এদের যদি কীর্তি লোপ হয় তা হলে এঁদের গায়ে লাগবে না, এঁরা এখন তার উর্ধ্বে। কিন্তু আমরা যাঁরা এঁদের কীর্তির মূল্য বুঝি তাদের গায়ে লাগবে না? এঁদের বাণীর মূল্য যদি এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়ে না থাকে তবে সে মূল্য বিনষ্ট হতে দেখলে আমাদের কারো মনে লাগবে না?

কতগুলো মিথ্যা এখন মানুষকে সত্যের মুখোশ পরে বিভ্রান্ত করছে। তার মধ্যে এটাও একটা যে আমাদের মনীষীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারক আর বাহক আর যেহেতু এটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি সেহেতু এটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পচা। ফরাসী ভাষায় বুর্জোয়া বলতে যাদের বোঝায় তারা প্রধানত কলকারখানার মালিক, দোকানদার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার বা পরের ধনে ধনী। সে রকম একটা শ্রেণী গড়ে উঠতে ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রায় দু'শো বছর লেগেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই শ্রেণী শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠেছে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব হলোই বা কবে, বাঙালীরা তার সুযোগ নিলই বা কবে? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করলে প্রায় অর্ধশতাব্দী হলো আমাদের এদেশও বুর্জোয়ার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সেই বুর্জোয়া পরিবারগুলিকে আস্ত একটা সমাজ বলা যায় না। সংস্কৃতির উপর তাদের প্রভাব অতি ক্ষীণ।

মধ্যবিত্ত বলে আর একটা কথা আছে। এটা বুর্জোয়ার সমর্থক নয়। অনেক সময় বোঝবার ভুলে আমরা মধ্যবিত্তকেই বুর্জোয়া বলে চালিয়ে দিই। মধ্যবিত্তরা সাধারণত চাকুরিজিবী। বেশীর ভাগই কেরানী বা শিক্ষক। সুদ, মুনাফা, খাজনা বা বাড়ী থেকে যারা বড়লোক তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেই ক'জনকে বুর্জোয়া বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্তের আয়ের উৎস হচ্ছে মাসের শেষে মাইনে। উকিল বা ডাক্তার হয়ে থাকলে ফী। তাদের মধ্যে ক'জনেরই বা হাতে টাকা জমে, জমানো টাকা থেকে আরো

টাকা আসে! বুর্জোয়ার প্রধান লক্ষণ হলো টাকা থেকে আরো টাকা। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস সেরকম নয়। এই শ্রেণীকে বুর্জোয়া আখ্যা দিলে শুধু যে এর প্রতি অবিচার করা হয় তাই নয়, শব্দটারই অপব্যবহার করা হয়।

সম্ভবত এদেশেও একটা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠবে। যেমন ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এমন একটি শ্রেণীর পিণ্ডি মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে চাপবে কেন? মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ কেন তাদের হয়ে জবাবদিহি করবেন? রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব কোথায়? কবে তিনি তাদের মনের কথাটাই ব্যক্ত করলেন? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে মধ্যবিত্তদের বন্ধু বলতে পারা যায়, কিন্তু বুর্জোয়াদের তিনি কেউ নন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের বিস্তার, সেইসঙ্গে চাকরির একটা হিল্লে। কলকারখানা, আমদানী রপ্তানী, ব্যাঙ্ক ইনশিওরান্স ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি থাকলে তিনি ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করতেন না। যার ফলে গ্রাজুয়েটের চাহিদার চেয়ে জোগান গেল বেড়ে, বাজারদর এসে চল্লিশ টাকায় ঠেকল। তাও দুর্লভ।

বাংলার মধ্যবিত্তরা ভুল নিশ্চয়ই করেছেন অনেক। কিন্তু এ ভুলটা করেননি যে সংসারে অর্থোপার্জন ও অর্থবৃদ্ধিই হবে মুখ্য, জ্ঞানলাভ ও সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে গৌণ বা তুচ্ছ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বদনাম ছিল যে তিনি বাঙালীর ছেলেকে মাড়োয়ারি করতে চান। এ কালের পরিভাষায় বুর্জোয়া করতে চান। না, বাংলার মনীষীরা তাদের বুর্জোয়া করতে চাননি। মধ্যবিত্ত করতে চেয়েছিলেন। একালে যাদের বলা হয় নিম্নমধ্যবিত্ত। তবে একেবারে নিঃস্ব করতে চাননি। না, শ্রমিক বা কৃষক করতেও নয়, সেটা গান্ধীবাদী চিন্তা।

গান্ধীবাদী চিন্তাও কমিউনিজমের দোসর। কমিউনিজমের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার জন্যে গান্ধীজী কঠোর কায়িক শ্রমের উপর ও নির্লোভের উপর জোর দেন। তাঁর শিক্ষা ক'জনই বা বুঝেছে বা নিয়েছে! নিলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো। অথচ সেই মানুষের প্রতিকৃতি যত্র তত্র দগ্ধ হচ্ছে। যেহেতু তিনি ধনকুবেরদের বন্ধু। বন্ধু তো তিনি দীনতমদেরও ছিলেন। অস্পৃশ্যদেরও ছিলেন। অবলাদেরও ছিলেন। কুষ্ঠরোগীদেরও ছিলেন। বন্ধু তিনি সর্বশ্রেণীর। কিন্তু কী করে এ ধারণা জন্মায় যে তিনি শোষণের সমর্থক ছিলেন?

গান্ধীজীর কথা থাক। বাংলার মনীষীদের কথাই বলা যাক। সকলেই

এঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সংস্কৃতি চিরকালের। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করা অত্যাবশক। এর থেকেই আসে ইংরেজী শিক্ষায় রুচি। বাঙালী একদিন ইংরেজী শিক্ষায় গভীর আনন্দ পেয়েছে। তার সেই আনন্দ প্রকাশ করতে চেয়েছে ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টি করে। পরে তার আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম হয় বাংলা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষার সুফল। যে সংস্কৃতি তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল সে সংস্কৃতি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও মনন। যে সংস্কৃতি তাঁদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হলো তার সঙ্গে মেশানো ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ও আদর্শ। এমনি করে ঘটে আমাদের রেনেসাঁস, তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয় রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার। ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত সুবিধার জন্যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর দেশবাসীর ক্রোধের ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। কত লোক যে সমাজের হাতে মার খেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শতখানেক বছর আগেই লিখেছেন 'সাম্য'। সাম্যবাদী ইশ্‌তাহারহিসাবে তখনকার দিনে অভূতপূর্ব। দেশ তাঁর "আনন্দমঠ"কে নিল, "বন্দেমাতরম্"কে নিল, কিন্তু 'সাম্য'কে নিল না। নেবার সময় হয়নি বলে। কিন্তু তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। সে কাজ বুর্জোয়ার কাজ নয়, দূরদ্রষ্টা ও ঋষির কাজ। প্রমথ চৌধুরী অর্ধশতক আগে "রায়তের কথা" লেখেন। দেশ তখন নিল না, এখনো কি সমস্তটা নিয়েছে? তাঁর কথ্যভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব এতদিনে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভূমিসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব এখনো ঝুলছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তো অন্ত্যজদের ভাই বলে ভাবতে বলে গেছেন। বহুদূর থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে ইতিহাসের শূদ্রযুগ আসন্ন। সোশিয়ালিজমকেও তিনি আবাহন করে ঘরে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না, নামটাও জানত না, তত্ত্বটাও অজানা। দেশ যদি সত্যি সত্যি সোশিয়ালিজমের পক্ষপাতী হয় তবে স্বামীজীকে বিপক্ষের লোক মনে করে আলকাতরা মাখাতে পারে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বর্জনীয় আর সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁরা দণ্ডনীয় তা হলেও একবার তো বিচারকের ভূমিকা নিয়ে বিচার করতে হয়। তার

আগেই সরাসরি জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি সামাজিক ন্যায়ের নমুনা? মারতে চাও মারো, তার আগে বিচার তো একবার করো, আসামী তরফের কথাটা তো একবার শোন, তাঁদের আত্মরক্ষার সুযোগ তো একবার দাও।

বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় যে বিবেকানন্দ যে অপরাধ করেছেন তার যথাযোগ্য শাস্তি তাঁর মূর্তির মুখে আলকাতরা লেপন বা আশুতোষ যে অপরাধ করেছেন সে অপরাধের উপযুক্ত সাজা তাঁর মুণ্ডপাত তা হলে আমরা আর তর্ক না করে ভাবীকালের উচ্চতর আদালত আপীল দায়ের করে ক্ষান্ত হব। ভাবীকালের বিচারের উপর আমাদের আস্থা আছে। একালের বিচারের উপরেই বা থাকবে না কেন! মানুষ যদি নিতান্তই অবুঝ না হয় তো একালেই তাকে বোঝানো সম্ভব যে নির্বিচার হিংসার নাম সামাজিক ন্যায় নয়। সামাজিক ন্যায় যারা চায় তাদেরও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আগে সম্যক বিচার, তারপর সম্যক দণ্ড।

আমাদের তরুণদের মধ্যে এ পরিমাণ অন্ধতা বা হিংসা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। এতে এদের নিজেদেরই মামলা দুর্বল হচ্ছে। ফলে মামলায় এদের হার হবে। ইতিহাস তো এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। গোড়ার দিকে ফাউল করতে করতে যে জেতে আখেরে যে তারই জিত হয় তা নয়। তাই যদি হতো তবে হিটলারের ব্লিৎসক্রিগ ও তোজোর পার্ল হারবারই তাদের জয় পাকা করত।

আমরা বোমার বদলে বোমায় বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তলোয়ারের বদলে কলমে বিশ্বাস করি। তলোয়ার যা পারবে না কলম তা পারবে। কলম হচ্ছে তলোয়ারের চেয়েও জোরদার। এই পরিস্থিতিতে লেখকদের কর্তব্য বিচারবিমুখদের বিচারে প্রবৃত্ত করা ও হিংসাব্রতীদের হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলা।

এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ আরো অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে দৈনিকে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল।

এই অরাজকতা

একপ্রকার না একপ্রকার অরাজকতা এখন দুনিয়ার নানা দেশে। ভারতের নানান অঞ্চলে। কোথায় যে মানুষ তার থেকে মুক্ত তা বলা কঠিন। যেসব দেশে অরাজকতা নেই—যেমন রাশিয়ায় বা স্পেনে—সেসব দেশে জবরদস্ত ডিকটেটর শাসন। অরাজকতাও যেমন নেই ব্যক্তিস্বাধীনতাও তেমনি নেই। কোন্‌টা যে কোন্‌টার চেয়ে কাম্য কে সেকথা বলবে!

ডিকটেটরশিপ বা অরাজকতা কোনোটাই আমার কাম্য নয়। আমি পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর পক্ষপাতী। কিন্তু ক'টা দেশেই বা এ ব্যবস্থা বিধিমতো চলছে আর রীতিমতো কাজ দিচ্ছে? সমাজতন্ত্রে পৌছে দিয়েছে দুটি কি একটি দেশে। তাদের লোকসংখ্যা কম, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশী। আমরা এখনো সমাজতন্ত্রে পৌছইনি। কবে পৌছব তা কেউ জানে না। কোনোদিন পৌছতে পারব কি না সন্দেহ। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ার আগে গণতন্ত্রই ভেঙে পড়বে। তার ভাঙনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী কেন আমি চাই? চাই এইজন্যে যে, এক হাতে অরাজকতা অন্য হাতে ডিকটেটরশিপ এই দুই অবাঞ্ছনীয় পরিণতিকে রুখতে পারে একমাত্র পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী। কিন্তু তার কয়েকটি প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। সেগুলি অগ্রাহ্য করে কেবল সংখ্যার জোরে বা টাকার জোরে নামকা ওয়াস্তে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী চালাতে গেলে তা শেষপর্যন্ত অচল হয়। আমার আশঙ্কা যে আমাদের দেশেও যেসব শর্ত অগ্রাহ্য হচ্ছে।

একটি শর্ত তো হলো এই যে সবাইকে আইনের শাসন মানতে হবে। আইন ইচ্ছামতো পালটানো যায়, কিন্তু আইনকে হাতে নেওয়া যায় না। যে যার সুবিধামতো আইনভঙ্গ করলে জঙ্গলের আইন এসে মানুষের আইনকে হাটিয়ে দেয়। তাই হয়েছে আজ।

আর একটি শর্ত হলো দুর্বলের পক্ষ নিয়ে প্রবলের সঙ্গে সংগ্রাম। প্রবল যে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে দুর্বলের ঘাড়ে চেপে বসে তার দৃষ্টান্ত দেশে বিদেশে ভুরি ভুরি। ধনতন্ত্র ও রণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের কলকাটি নাড়ে ও নিজেদের স্বার্থে আর সবাইকে খাটায় বা ভোগায় এটা কারো অজানা নয়।

আরো একটি শর্ত, পার্লামেন্টের মাধ্যমে বিপ্লব হয় না, হতে পারে না। যাঁরা বিপ্লব চান তাঁরা পার্লামেন্টে গিয়ে ও জিনিস পাবেন না। মাঝখান থেকে পার্লামেন্টকেই ভাঙবেন। তাতেও যে তাঁদের লক্ষ্য সুগম হবে তা নয়। পার্লামেন্টের শূন্যতা মিলিটারি ডিকটেটরশিপও পূরণ করতে পারে। বিপ্লব যদি চলে ডালে ডালে তো প্রতিবিপ্লব চলে পাতায় পাতায়। আখেরে কে যে জয়ী হবে তা গণৎকারও জানে না।

আমাদের চার হাজার বছরের একটানা ইতিহাসে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী মাত্র বিশ বছরের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়। ইংরেজরা স্বীকারই করত না যে তাদের দেশের গণতন্ত্র ভারতের মাটিতে রোপণ করলে বেঁচে বর্তে থাকবে। গান্ধীজী তো বিশ্বাসই করতেন না যে ইংরেজদের পার্লামেন্ট একটা মূল্যবান বস্তু। নেতাজীও স্বদেশের জন্য পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা চাননি। বামপন্থীদের অধিকাংশই এ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। এখনো তাদের সেই বিরুদ্ধভাব দূর হয়নি। তা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। এ ব্যবস্থা টিকে আছে।

দেশের সাধারণ লোককে ভোট দিতে বললে তারা ভোট দেয় বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ যেমন সর্বক্ষণ পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে চিন্তা করে এদেশের জনসাধারণ তেমন নয়। এরা পাঁচ বছরে একবার ভাবে। ইতিমধ্যে এদের যে যা বোঝায় তাই করে। ধর্মঘট, ঘেরাও, গায়ের জোরে জমি দখল, দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ। পুলিশ এক্ষেত্রে কী করতে পারে? পুলিশের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তার হাতে আরো কমসংখ্যক বন্দুক। পুলিশ যদি গুলী চালায় তৎক্ষণাৎ তাকে জবাবদিহি করতে হয়, কিন্তু জনতা যদি লুটপাট খুনখারাবি করে তাকে শাসন করবার কেউ নেই। সাক্ষী পাওয়া যায় না। আদালত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সরকার থেকে মামলা তুলে নেওয়া হয়।

যে প্রশ্নটার উত্তর আমাদের সবাইকে দিতে হবে সে প্রশ্নটা এককথায় এই। আমরা যদি পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলে থাকি তবে এত খরচপত্র করে নির্বাচন কেন? আর এতগুলি নির্বাচিত প্রার্থীর পেছনেও তো কম খরচাটা হয় না। হিসাব করলে দেখা যাবে যে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এর পূর্ববর্তী বুরোক্রাটিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়বহুল। জনসাধারণকেই এর বাড়তি বোঝা বইতে হচ্ছে। অথচ জনসাধারণের লাভের ঘরে কী থাকছে? জনসাধারণ যদি একদিন উত্ত্যক্ত হয়ে বলে, "চাইনে এ ব্যবস্থা"

তা হলে কোথায় থাকবে নির্বাচন, কোথায় আইনসভা, কোথায় মন্ত্রীমণ্ডল?

এই যে অরাজকতা এটা যেন একটা চৌরাস্তা। আমাদের মনঃস্থির করতে হবে আমরা কি পার্লামেণ্টারি সড়ক ধরে চলব, না ডানদিকে মোড় ফিরে ফ্যাসিস্ট ডিকটেটরশিপের পথ ধরব, না বামদিকে মোড় ফিরে কমিউনিস্ট ডিকটেটরশিপের অভিমুখে যাব? মনঃস্থির করা সহজ নয়, কারণ প্রত্যেকটি রাস্তার আকর্ষণ লোভনীয়। তবে কতক ব্যক্তি আছেন তাঁরা একই সঙ্গে দুই রাস্তার সুফল ভোগ করবেন। একদিকে পার্লামেণ্টের মেম্বর, অন্যদিকে বিপ্লবী নায়ক। এটা শুধু ভারতের মাটিতেই সম্ভব। কিন্তু এতে করে রাজনৈতিক বিবর্তন হয় না। জনসাধারণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকে। এমনি করে যুবকদের মাথা খাওয়া হচ্ছে। ছাত্ররা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

আমি জানতুম যে ইংলণ্ড তার পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার থেকে বিচ্যুত হবে না, হলে অনর্থ বাধবে। অথচ, যে ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ফল দিয়েছে সে ব্যবস্থা এদেশের উপযুক্ত নয়, এ দেশের জন্যে চাই পঞ্চায়তী ব্যবস্থা, এই ছিল আমার মত। ইতিমধ্যে আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, তাই মতও বদলেছে। পঞ্চায়তী ব্যবস্থা নিচের স্তরে চলতে পারে, কিন্তু উপরের স্তরে চলবে না। চালাতে গেলে যা হবে তা পঞ্চায়তী হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র নয়। সকলেই তো গান্ধী বা বিনোবা নন, আদর্শবাদী নন। সাধারণ রাজনীতিকদের উপর পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থায় যতরকম চেক ও ব্যালান্স আছে পঞ্চায়তী ব্যবস্থায় ততরকম থাকবে না। অন্তত দুনিয়ায় কোথাও তার নজীর নাই। ভারতের ইতিহাসেও না। কোনোকালেই এদেশের কেন্দ্রীয় শাসন বা প্রাদেশিক শাসন পঞ্চায়তী শাসন ছিল না। তেমন কিছু করতে গেলে একশোবার ভাবতে হবে, একশো রকমে তৈরি হতে হবে।

তা না হলে যা হবে তা এই অরাজকতা। আর এর থেকে উদ্ধারের জন্যে একপ্রকার না একপ্রকার ডিকটেটরশিপ। পাকিস্তানে ও বর্মায় আমরা সামরিক একনায়কত্ব দেখছি। গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের জন্যে বর্মা ব্যাকুল নয়। পাকিস্তান ব্যাকুল। সীমান্তের এপারে গণতন্ত্র চলছে বলে তার ধারণা সীমান্তের ওপারেও চলবে। ভিতরে ভিতরে সবাই জানে একই তো দেশ। কিন্তু একবার সামরিক একনায়কত্বের কবলে পড়লে সহজে পরিত্রাণ নেই। পাকিস্তান যদি গণতন্ত্র ফিরে পায় আমি আনন্দিত হব। কিন্তু তার আগে ভারতেই গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে। ভারতেই তা বিকল হলে পাকিস্তানে

তার পুনঃপ্রবর্তন কি দৃঢ়মূল হতে পারে?

আমাদের সংবিধানসিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী করে দৃঢ়মূল হবে সেইকথাই ভাবতে হবে। তার শিকড় যদি গভীরে না যায়, সাধারণ লোকের অন্তরে প্রবেশ না করে, তারা তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ বা শ্রেণীস্বার্থের জন্যে হন্যে হয়ে যদি যে-ডালে বসেছে সেই ডাল কাটে তবে ঘোরতর অরাজকতার ভিতর দিয়ে যেতে হবে সবাইকে। বাধ্য হয়ে একদিন মিলিটারিকে ডাকতে হবে। তার ফলে অরাজকতাও যাবে, ব্যক্তিস্বাধীনতাও যাবে।

আমি আগেই বলেছি যে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার কতকগুলি প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। সেগুলি মেনে চললে বিপ্লব হবে না, কিন্তু জনগণের হাতে ক্ষমতা আসবে ও সামাজিক রূপান্তর ঘটবে। খুব দ্রুতগতিতে নয় যদিও। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে এখন যে গতিতে চলেছে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে চলাও জরুরি। এই অরাজকতার সেটাও একটা কারণ। স্পীড বাড়ানো দরকার, কিন্তু র‍্যাশ ড্রাইভিং নয়, হুঁশিয়ার হয়ে চালাতে হবে।

তৃতীয় এক শক্তি

হিংসা যেখানে সক্রিয় প্রতিহিংসাও সেখানে সক্রিয়। সাধারণত এইটেই আমরা দেখি। কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসা ব্যতীত আরো একটা কথা আছে, তার নাম অহিংসা। হিংসা প্রতিহিংসার মতো অহিংসাও একটা শক্তি। হিংসা প্রতিহিংসার মতো অহিংসাও সক্রিয় হতে পারে। অহিংসা যদি সক্রিয় হয় তা হলে তার শক্তি কত প্রবল হয় তার দৃষ্টান্ত আমরা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে দেখেছি। অতি সামান্য ভাবে তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মুষ্টিমেয় কুলী মজুর শ্রেণীর লোকদের নিয়ে। পরে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে অহিংসার অসামান্য বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেয়।

অহিংসা যে কত বড়ো একটা শক্তি এ শিক্ষা তাঁর কাছে পাবার পর তাকে কেবল ব্যক্তিগত সাধনা হিসাবে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাকে সমষ্টিগত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাকে সর্বক্ষণ সক্রিয় রাখতে হবে। নতুবা হিংসার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়াবে যে তার নাম প্রতিহিংসা। হিংসা আর প্রতিহিংসার তাণ্ডবে অহিংসা হবে কোণঠাসা, হবে হতবুদ্ধি, হবে অকর্মণ্য। যদি না সাহস করে এগিয়ে যায়, আঘাত বরণ করে, অভয় হয় ও অভয় দেয়।

অহিংসাকে সক্রিয় করে তুলতে হলে আমাদের প্রথম দরকার অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া। অভয়মন্ত্রই আমাদের জীবনে শান্তিমন্ত্র। অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমাদের শান্তির কাজে নামতে হবে, সকলের কাছে এই অভয়মন্ত্রকে পৌঁছে দিতে হবে। অন্তরে নির্ভীক হলে তবেই আমরা অহিংসার শক্তি প্রকাশ করতে পারব। যেখানে মানুষ খুন হচ্ছে সেখানে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যেখানে ঘর পুড়ে যাচ্ছে সেখানে আগুন নেভানোর জন্যে ছুটে যেতে হবে। যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে গড়ার কাজে ভয়শূন্য হয়ে হাত লাগাতে হবে।

বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে, কোনো কিছু ধ্বংস করা সহজ, কিন্তু সৃষ্টি করা শক্ত। একটা গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়ে যে আনন্দ একটা গ্রন্থ রচনা করে তার শতগুণ

আনন্দ। একটি মূর্তি ভেঙে ফেলে যে আনন্দ একটি মূর্তি নির্মাণ করে তার শতগুণ আনন্দ। একটি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যে আনন্দ একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে তার শতগুণ আনন্দ। একটি প্রাণীকে মেরে ফেলে যে আনন্দ একটি প্রাণীকে বাঁচাতে গিয়ে তার শতগুণ আনন্দ।

সংস্কৃতির দীপাবলী নিভিয়ে দিলে দেশে অন্ধকার নেমে আসবে। সংস্কৃতিকে জ্বালিয়ে রাখাই আমাদের কর্তব্য। অন্ধকার যেখানে সক্রিয় আলোককেও সেখানে সক্রিয় হতে হবে। আমাদের সমস্যা অনেক। তার সমাধান কী ভাবে হবে, কোন্ পথে হবে তার জন্যে অনেক আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রয়োজন লোকের মন থেকে ভয় দূর করে দেওয়া, অহিংসাকে শক্তিরূপে অনুভব করা। এই পদযাত্রা সেই অভিমুখে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পদযাত্রীদের আমি অভিনন্দন করি। তাদের জয় হোক।

[গত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭০ ত্রিবেণী থেকে আগত সর্বোদয় শান্তিপদ-যাত্রীদের কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অভ্যর্থনাকালে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলুম শ্রী তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার অনুলিপি প্রস্তুত করে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এটি তার অনুলিপির সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ।]

হিংসা অহিংসা

এ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই এদেশে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের উদ্যোগ শুরু হয়। গান্ধীজীর কাজ হলো হিংসাশ্রয়ী অথচ বৈপ্লবিক কর্মপন্থার সন্ধান দিয়ে দেশের লোককে হিংসার পথ থেকে অহিংসার পথে আকর্ষণ করা। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও দেখা গেল বেশ কিছুসংখ্যক লোক অহিংসার পথ ছেড়ে হিংসার পথে আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আকর্ষণ করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ, নৌসেনা বিদ্রোহ, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা।

মহাত্মার তিরোধানের পর বিনোবাজীর নেতৃত্ব অহিংসাশ্রয়ী কর্মপন্থা চালিয়ে যায়, কিন্তু সংঘর্ষকে এড়িয়ে যায়। অহিংস অসহযোগ, গণসত্যাগ্রহ ইত্যাদি অচল মুদ্রায় পরিণত হয়। এই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আবার সেসব মুদ্রা চালু হয়েছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এপারে তার অনুরূপ কিছু নেই। সে পাট উঠে গেছে। তার জায়গায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে পূরণ করবার জন্যে আছে সংবিধানসম্মত অপোজিশন। কিংবা বড় জোর ধর্মঘট, 'বন্ধ' ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ কর্মপন্থা। এসব বৈপ্লবিক নয়।

কাজেই বিপ্লববাদী যারা তারা আবার সেই হিংসাশ্রয়ী বৈপ্লবিক পন্থার মধ্যে শূন্যতার পূরণ খুঁজছে। তারা গান্ধীপূর্ব যুগে ফিরে যাচ্ছে। আবার সেই বোমা, আবার সেই বন্দুক, এবার তার সঙ্গে ছোরা ছুরি লোহার ডাণ্ডা। সেকালের মতো একালেও বিস্তর লোক মনে মনে বাহবা দিচ্ছে। গোপনে গোপনে সহযোগিতা করছে। এমন সব গুজব রটাচ্ছে যা শুনলে মনে হবে আততায়ীদের কোনো দোষ নেই, নিহতদেরই দোষ। কিংবা যত দোষ নন্দ ঘোষ। পুলিশ আর মিলিটারি।

যেদেশে রাষ্ট্র বলে একটা সংস্থা রয়েছে সেদেশে মিলিটারিও থাকবে, পুলিশও থাকবে। তারা যদি থাকে তবে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না। মানুষের ধন প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে মানুষকে ধরবে, বাঁধবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুলীও চালাবে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে অনুষ্ঠিত এই হিংসা সংবিধানসম্মত। আর সংবিধান হচ্ছে জনগণের স্বার্থে তাদেরই প্রতিনিধিদের

দ্বারা রচিত। সুতরাং এই হিংসা জনগণের দ্বারা সমর্থিত। অধিকাংশ লোক যদি পুলিশ ও মিলিটারির পেছনে দাঁড়ায় তবে অল্পসংখ্যকের হিংসাশ্রয়ী বৈপ্লবিক প্রয়াস আয়ত্তের বাইরে যাবে না। ইংরেজ আমলেও আয়ত্তের বাইরে যায়নি।

তার মানে এই নয় যে সমস্যার সমাধান এইভাবেই হবে। না, সমাধান অত সহজ নয়। অহিংসকদেরও উদ্যোগী হতে হবে। কী ভাবে, সেটা তাঁরা ভেবে দেখুন।

আর আমরা যারা ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচিত তাদেরও ভেবে দেখতে হবে কী করা উচিত। বলা বাহুল্য আমরা কর্মী নই, সৈনিক নই। আমাদের করা মানে রাস্তায় নেমে আসা নয়। কোন একটি পার্টিতে যোগ দিয়ে সেই পার্টির নির্দেশ মেনে নিয়ে কাজ করলে আমরা আর ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচিত হব না। হব পার্টি ওয়ার্কার বলে। আমাদের পক্ষে সেটা হবে ইনটেলেকচুয়াল মার্গ থেকে বিচ্যুতি। তার ফলে আমাদের না হবে এদিক, না ওদিক। আমরাই ব্যর্থ হব।

আমাদের করা মানে ভাবা, বলা ও লেখা। আমাদের করা মানে দেখা ও শেখা। আমরা কোন পক্ষেরই শত্রু নই। হিংসাচারীদের উপরেও আমাদের বিদ্বেষ নেই। তবে নিরীহ মানুষের প্রাণ সংহার করে যদি কোন বিপ্লব হয় তবে তা কখনো সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে না। তেমনি অমূল্য সম্পদ ধ্বংস করাও সমর্থনযোগ্য নয। শুভবুদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করব ও রাত জাগব।

দীর্ঘকাল পরে এদেশ স্বাধীন হয়েছে ও গণতন্ত্র পেয়েছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এগুলিও অমূল্য সম্পদ। এদেশের জনসাধারণ কখনো এগুলিকে বিকিয়ে যেতে দেবে না, ধ্বংস হতে দেবে না। প্রাণপণে বাধা দেবে।

পুনশ্চ—

শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সাধারণ ধর্মঘটের অভিমুখে যাচ্ছে ঠিক এমন সময় রাষ্ট্রপতি ইয়াইয়া খান্ ও তাঁর দলবল প্রচণ্ড আঘাত হেনে পূর্ববাংলার বিদ্রোহের মেরুদণ্ড পদাঘাতে ভেঙে দিতে যান। ফলে মুজিবুর নিখোঁজ। হয়তো বন্দী, নয়তো নির্বাসিত। নেতৃহীন জনতা পরিস্থিতিকে আপনার হাতে নিয়েছে। হিংসার উত্তর দিয়েছে প্রতি-হিংসায়। গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে।

তা সত্ত্বেও মুজিবের অহিংস অসহযোগ পরিত্যক্ত হয়নি। আবার যদি জাতীয় পরিষদ ডাকা হয় মুজিব তাঁর শর্ত মানিয়ে নেবেন, নয়তো পরিষদ্ বর্জন করবেন। তাঁর দলবল যদি তাঁর নির্দেশ মান্য করে দূরে সরে থাকে তাহলে আখেরে তিনিই জিতবেন আর সেটা হবে অহিংস অসহযোগ নীতিরই জয়। নিছক গায়ের জোরের পরীক্ষায় পাকিস্তানের ঘরোয়া মামলার নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হয় না আমার।

রাজধর্ম

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের কার্যকলাপ আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। দেশের আইন যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড দিয়েছে এঁরা অহিংসার নামে তার প্রাণদণ্ড মকুবের জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করবেন, সরকারের উপর চাপ দেবেন। তাও যদি দণ্ডিত ব্যক্তি স্বয়ং অনুতপ্ত হয়ে প্রাণভিক্ষা করত! মহাত্মা সবাইকে ক্ষমা করতেন বলে রাষ্ট্রও যদি সবাইকে ক্ষমা করে তা হলে আইন আদালতের কোনো প্রয়োজন থাকে না। আইন আদালতের সৃষ্টি হয়েছে এইজন্যই যে রাষ্ট্র যদি অপরাধীকে বিচারের সুযোগ দিয়ে বিচারকের রায় অনুসারে দণ্ড না দেয় তবে জনসাধারণ নিজেরাই বিনা বিচারে তাকে যথেচ্ছ দণ্ড দেবে। আজকাল বিচারের উপরেও লোকের বিশ্বাস টলেছে, তাই লোকে যাকে অপরাধী বলে সন্দেহ করে তাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে নিজেরাই মারতে মারতে মেরে ফেলে। একবার একটি গ্রামে একদল গয়লা একদল মুসলমানের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। গান্ধীশিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে কয়েক জন এসে বলেন যে শান্তি স্থাপন করতে হলে গয়লাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো উচিত নয়,অতএব মামলা তুলে নিতে হবে। আইনে আসামীকে এতরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যে সত্যিকার অপরাধীও অনেক সময় আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যতজনের বিচার হয় ততজনের সাজা হয় না। হলেও যতজনের লঘুদণ্ড হয় ততজনের গুরুদণ্ড হয় না। ফাঁসীর হুকুমও কেঁচে যায়। এ ছাড়া উপযুক্ত কারণ দেখলে রাষ্ট্রপতিও প্রাণদণ্ড মকুব করেন। সেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। একেবারে অব্যহতি দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশ থেকে এখন প্রাণদণ্ড উঠে যাচ্ছে। এদেশ থেকেও একদিন উঠে যাবে। কিন্তু প্রাণদণ্ড উঠিয়ে দেবার জন্যে আন্দোলন না করে ব্যক্তিবিশেষের বেলা অহিংসা নীতি প্রয়োগ করার অর্থ অশোভন পক্ষপাতিত্ব। এর ফলে আইন ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়। লোকে আইনকে নিজের হাতে নেয়। হিংসার প্রকোপ বাড়ে। বিশেষ করে সাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামার বেলা। যেমন ওই গয়লাদের মামলায়।

ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমি বলেছিলুম, "ওরা যাদের ঘর পুড়িয়েছে তাদের

ঘর নিজের হাতে বানিয়ে দিক। তাদের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে আগে সে অন্যায়ের প্রতিকার করুক। মামলা তুলে নেবার কথা তার পরে ভাবা যাবে। না, এখন জামীনে খালাস দেওয়া হবে না। টাকা দিয়ে সাক্ষী ভাঙিয়ে নেওয়া চলবে না। পুলিশকেও তার কর্তব্য করতে দিতে হবে।" বলা বাহুল্য, ওরা অপরাধ স্বীকার করেনি। প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই করেনি। গোরু ছেড়ে দিয়ে পরের ক্ষেত নষ্ট করাই তাদের রীতি। হিন্দুরাও ভুক্তভোগী। তাই জনমত ওদের দিকে নয়। গান্ধীশিষ্য বলে যাঁরা ওদের পক্ষ নিলেন ওঁরাই নিজেদের নৈতিক নেতৃত্ব হারালেন। পাপকে ক্ষমা করবে না, পাপীকে ক্ষমা করবে। এই হলো গান্ধীজীর শিক্ষা। কার্যত তাঁরা পাপকেও ক্ষমা করলেন। আর পাপীকে ক্ষমা করার কথা উঠবে কী করে, কেউ যদি পাপ স্বীকার না করে?

নৈতিক নেতৃত্ব দুষ্কৃতকারীকে বাঁচানোর জন্যে যতটা ব্যাকুল যাদের উপর দুষ্কৃত করা হয়েছে তাদের বাঁচানোর জন্যে ততটা নয়। হওয়া উচিত ছিল ঠিক উল্টোটি। পূর্বপাকিস্তানের এক ম্যাজিস্ট্রেট হাঙ্গামাকারী মুসলমানদের ডেকে বলেন, "তোমরা যেসব হিন্দুর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছ সেসব বাড়ী আবার বানিয়ে দাও। নইলে আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদেরও বাড়ী পুড়িয়ে দেব।" ফল হলো। মুসলমানরা হাকিমের হুকুম মানল। এরূপ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যেটা করলেন সেটা আইন না হলেও শাসন। তবে তাঁর উপরওয়ালারা তাঁকে সেই পদে রাখলেন কি না কে জানে? ঘটনাটা ১৯৬৪ সালের। মহকুমা নওগাঁ। এককালে আমিও সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম। যে আমাকে জানায় সে একজন হিন্দু। বলা বাহুল্য হাকিম স্বয়ং মুসলমান। একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ।

আইনের মর্যাদা রক্ষা করে কীভাবে গান্ধীনীতির প্রয়োগ করতে হবে সেটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। নয়তো দুষ্টের দমন হবে না, শিষ্টের পালন হবে না। অধর্ম হবে। কিন্তু দুষ্ট যারা হয় তারা অধিকাংশ স্থলে অভাবের তাড়নায় হয়। অশিক্ষার দরুণ হয়। চীন দেশের মহাগুরু কনফুসিয়াস সেইজন্য আড়াই হাজার বছর আগে বিধান দেন যে মানুষকে আগে জোগাও খাদ্য, তার পরে জোগাও শিক্ষা। সমাজ রাখতে হলে এই দুটি ফরজ। একান্ত আবশ্যক কর্ম। আমাদের মহাগুরু গান্ধীজী খাদ্য না বলে তার জায়গায় বলেছেন খাদি। খাদি এনে দেয় অন্নহীনকে অন্ন। বলা বাহুল্য যেমন খাদ্যের পেছনে তেমনি

খাদির পেছনেও থাকবে খাটুনি। মেহনৎ করেই মানুষ শস্য ফলাবে, বস্ত্র বুনবে। কনফুসিয়াসের মতো গান্ধীজীও বরাত দিয়েছেন শিক্ষার। তাঁর মতে বুনিয়াদি শিক্ষার। যে শিক্ষা মানুষের হাতকে অলস রাখে না, তাকে চৌকশ করে তোলে।

সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তার ও দুটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম না করে তবে দুষ্টের দমন দিন দিন দুঃসাধ্য হয়। সাম্রাজ্যবাদী আমলে শাসকদের পলিসিই ছিল ভারতকে কাঁচামালের জোগানদার ও তৈরী মালের বাজার করে ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধ করা। ফলে বিস্তর লোক হয়েছে অন্নাভাবে ও শিক্ষাভাবে দুষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে চলছে কঠোর হস্তে দুষ্টের দমন। সে আমল তো আর নেই। তবু দেখা যাচ্ছে অপরাধের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়তির দিকে। যেসব স্থলে খাদ্যের বা শিক্ষার অভাব সেই সব স্থলেও দলবদ্ধ হয়ে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন। মানুষ চোখের সামনে মরে যাচ্ছে, তবু ডাক্তার তার কাছে যাবে না, জরুরি অপারেশন করবে না। কারণ প্রশাসকদের সঙ্গে ডাক্তারদের মর্যাদা সমান নয়। মর্যাদার প্রশ্নে সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা বন্ধ, যদিও প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ নয়। মর্যাদার প্রশ্নে এখন আবার রেলওয়ে বন্ধ হয়েছে। রেলকর্মীরাও চায় ব্যাঙ্ককর্মী প্রভৃতি পাবলিক সেকটর কর্মীদের সঙ্গে সমান মর্যাদা। সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি লক্ষ লক্ষ লোক অপরাধ করলে ক'জন দুষ্টের দমন হতে পারে? কে যে সমাজবিরোধী আর কে যে নয় সেই ব্যবধানটাই ঘুচে যাচ্ছে।

আগেকার দিনে যেটা ছিল ব্যতিক্রম এখনকার দিনে সেইটেই নিয়ম। দুষ্টের দমন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে না। খাদ্যের অভাব বা শিক্ষার অভাব আছে বলে ওরা দুষ্ট নয়। কেন তবে ওরা দুষ্ট? সে অনেক কথা। দুষ্টের প্রতি সর্বত্র যেমন নরম ভাব লক্ষ করছি তাতে শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে আইন আদালত জেল ফাঁসী কিছুতেই পরে শানাবে না। দণ্ড দিতে কারো সাহস হবে না। যে যার নিরাপত্তার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। সেরূপ পরিস্থিতিতে অকুতোভয় একমাত্র তারাই যাদের হাতে থাকবে বন্দুকের বাবা মেশিনগান। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী। তখন মেশিনগানের নল থেকে ক্ষমতা আসবে।

সেটা অবশ্য জনগণের হাতে নয়। রাজনীতিকদেরও যে তাতে কোন লাভ হবে তা নয়। জনগণের সঙ্গে তাঁদের বিশ্বাসেরও সম্পর্ক ছিন্ন হবে। যাঁরা

শিষ্টের পালন করতে জানেন না, তাঁদের বিদায়কালে কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। বলবে, "ও যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে।"

গান্ধীশিষ্যরা একটা সত্য মনে রাখবেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দেশে আর একটা শক্তি সক্রিয় ছিল বলেই গান্ধীজীয় গণসত্যাগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। তা যদি না হতো তবে সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে দস্যুবৃত্তির মধ্যে গণসত্যাগ্রহ কোথায় তলিয়ে যেত। ইংরেজ ছিল বলেই গান্ধী ছিলেন। বর্গী থাকলে বা মগ থাকলে গান্ধী থাকতেন না। তার মানে কিন্তু এ নয় যে আইন ও শৃঙ্খলা থাকাই যথেষ্ট।

গান্ধী শতবার্ষিকী ভাষণ

গান্ধীজীর দুটি ভূমিকার সঙ্গে আমরা পরিচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারূপে তিনি তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। আর তাঁর দ্বিতীয় ভূমিকায় তিনি অহিংসার সাধক ও সংগঠনী কার্যসূচীর রূপকার। এরকম অহিংসার সাধনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। সত্যাগ্রহের পরীক্ষা সম্ভবতঃ ইতিহাসে প্রথম বৃহদাকারে হল গান্ধীজীর উদ্যোগে। সে পরীক্ষা মহাত্মাজী শুধু ভারতের জন্যে করেননি, করেছেন সমগ্র বিশ্বের জন্যে। কারণ, ভারতকে তিনি বিশ্ব থেকে আলাদা করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতে যে সত্যাগ্রহের সাধনার শুরু, তা বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। বর্তমান ভারতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন বিনোবাজী আর আমেরিকায় তা পরীক্ষিত হয়েছে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে। দেখা যাচ্ছে, মহাত্মার মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁর সত্যাগ্রহের পরীক্ষা চলছে, তা থেমে যায় নি। ভিয়েতনাম-যুদ্ধে অনিচ্ছুক আমেরিকানদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীবাদকে শরণ করেছেন। যেমন যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তেমনি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অনেকে গান্ধীবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এমন একদল মানুষ দেখা যাচ্ছে, যাঁরা যন্ত্রশিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক জীবনকে অস্বীকার করে গান্ধীজীর পথে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তাঁরা গান্ধীজীর সংগ্রামের দিকটা না নিয়ে সংগঠনের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সাধনা চলছে কর্মের পথে।

যুদ্ধের উত্তেজনা সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই যারা করে, তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ যুগে অবশ্য যুদ্ধটাই শান্তির চেয়ে লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাতে বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। বহু মানুষের সুখের জন্যে মুষ্টিমেয় মানুষ যুদ্ধে প্রাণ দিলে খুব একটা ক্ষতি নেই—এরকম বিশ্বাস কারো কারো আছে। সেজন্যই তাদের যুদ্ধের জিগিরটা জাগিয়ে রাখতেই হয়। অথচ যারা মারণাস্ত্র তৈরি করেছেন তাঁরাই আবার গান্ধী আদর্শের প্রচারের জন্য অর্থব্যয় করেছেন। যেমন আমেরিকায় গান্ধী-চর্চা বেড়েছে, কিন্তু তা নাকি সম্ভব হচ্ছে ওয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকায়! ভারত সরকারও অস্ত্রের কারখানা ও গান্ধী শতবার্ষিকী

উৎসব একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। দুরকম পরস্পরবিরোধী কাজ একই সরকারের উদ্যোগে ঘটছে। মারণাস্ত্র ও চরকা পাশাপাশি রাখার চেষ্টা চলছে! ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। কোনো কোনো দেশ আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরি করে, কিন্তু সেটা যে ছলনা মাত্র, তা একদিন প্রকাশিত হবেই। তাঁরা এখন হিংসার বীজ বুনছেন, সভ্যতার ধ্বংসের ফাঁদ পাতছেন। তাঁরা যাকে আত্মরক্ষার উপায় ভাবছেন তাই একদিন আত্মঘাতী হয়ে উঠবে। পৃথিবীর এই অবস্থাটা পঞ্চাশ বছর আগে গান্ধীজী তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তাই তিনি একইসঙ্গে যন্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন। অহিংসার ঐতিহ্য দুনিয়াতে ছিল। তাকে যুগোপযোগী করে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে গান্ধীর পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে। তাঁর সত্যগ্রহের পথই হল যথার্থ পথ। সেটা সত্যরূপে জীবনে গ্রহণ করতে হবে, শুধু শৌখিনভাবে চরকা কাটলে কিংবা খদ্দর পরলেই চলবে না।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণের দেশে মারক্স, লেনিন ও মাও-এর প্রভাব পড়ে কেন? মারক্সবাদী কর্মিগণ জনগণের কাছাকাছি রয়েছেন, তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পেরেছেন, তাই মারক্সবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে গান্ধীবাদী কর্মীরা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দূরে সরে গেছেন, গ্রামের জীবন ছেড়ে তাঁরা শহরজীবনে আসক্ত হয়েছেন। কিন্তু গান্ধীবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সক্রিয়ভাবে গঠনমূলক কাজে যোগ দিতে হবে। নিরাশ হয়ে বসে থাকলে গান্ধী আদর্শকে রূপদান করা সম্ভব নয়। চরকা ও খদ্দরের মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শকে ধরে রাখলে চলবে না। তিনি যে গঠনমূলক কাজের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, আমাদের তা অনুসরণ করতে হবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের তুলে নিতে হবে। গুরুদেব ও মহাত্মাজীর উত্তরাধিকারীরূপে কিছু করতে হবে, কিছু দিতে হবে।

(গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ।—অনুলেখক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়)

ঐক্য আর বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ বা উপমহাদেশ যেখানে বৈচিত্র্যের আদি অন্ত নেই। অথচ ঐক্যেরও একটি অদৃশ্য সূত্র আছে। এই সূত্রটি রাজনীতি বা অর্থনীতির নয়, জাতি বা বর্ণেরও নয়, সমাজ বা ধর্মেরও নয়। তাহলে কি ভাষা ও লিপির? না, তাও নয়। তাহলে কি অশনের ও বসনের? না, তাও নয়। সহজে চোখে পড়ে না বলে এই সূত্রটিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়েও দেওয়া সহজ। অনেকেই সেই কাজ করেছেন। তাঁদের তর্কে পরাস্ত করা অসম্ভব। এ যেন নাস্তিকের সঙ্গে তর্ক।

যাঁরা সারা ভারতবর্ষ একবার ঘুরে এসেছেন বা বিদেশে গিয়ে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন যে কোথাও এক জায়গায় মিল আছে। সে মিল সব অমিলের উর্ধ্বে। সব অমিলের মূলে। তাই সবাইকে এক পরিবারের সন্তান বলে চেনা যায়। আমাদের জন্মের বহুপূর্বেই ইতিহাস আর ভূগোল মিলে এই পরিবারটার বিবর্তন ঘটিয়েছে বলা যেতে পারে। ইতিহাস এর জনক আর ভূগোল এর জননী।

যাঁরা বৈচিত্র্যকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা দেশভাগকে তার ন্যায়শাস্ত্রসম্মত পরিণতি বলে দাবী করেন। ধর্মগত বৈচিত্র্যের দাবীতে দেশ ভাগ হয়ে গেছে। তারপর যাঁরা তাতেও সন্তুষ্ট নন তাঁরা ভাষাগত বৈচিত্র্যের দাবী তুলে পাকিস্তানকে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। এদের একটার নাম বাংলাদেশ। ভাষার দাবীতে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিরও পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরল, পাঞ্জাব ও আসাম এর দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশ আমল থেকেই ছিল বঙ্গ, উৎকল ও সিন্ধু। তখনকার মধ্যপ্রদেশ ছিল দ্বিভাষী। এখনকার মধ্যপ্রদেশ একভাষী। কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না যে ভাষার দাবীতে একদিন তামিলনাড়ু পৃথক রাষ্ট্র হয়ে উঠবে না। জাতির দাবীতে নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম। ধর্মের দাবীতে কাশ্মীর। কমউনিজমের দাবীতে কেরল বা পশ্চিমবঙ্গ।

এসব সম্ভাবনা আছে বলেই আমরা ঐক্যের উপরে সবচেয়ে বেশী জোর দিই। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যদি বৈচিত্র্যের উপর আদৌ জোর না দিই বা সবচেয়ে কম জোর দিই তাহলে ভারতবর্ষের একটা মৌলিক সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। মৌলিক সত্যটা এই যে বৈচিত্র্যেও ঐক্যের সঙ্গে ওজনে সমান। বাটখারার দুই পাল্লা সমান ভারী হলেই পরস্পরের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবে। বৈচিত্র্য যদি বেশী ভারী হয় তবে ঐক্যহানি। ঐক্য যদি বেশী ভারী হয় তবে বৈচিত্র্যহানি। অনেকে আছেন তাঁদের মতে বৈচিত্র্যহানি ঘটলে তাতে কিছু আসে যায় না, বরঞ্চ তাতে ঐক্যের দৃঢ়তা। এঁরা সব ব্যাপারে হিন্দীর ফরমাস দেন। সর্ব ভাষায় দেবনাগরী লিপি প্রবর্তন করতে বলেন। এরপরে হযতো সবাইকেই সংস্কৃত পড়াবেন। যাতে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মেলাতে পারে।

কিন্তু কোথায় দাঁড়ি টানতে হয় তা যদি আমরা না জানি তাহলে ফল হবে ঠিক বিপরীত। মানুষে মানুষে মিল যেমন সত্য অমিলও তেমনি সত্য। সেইজন্যে ধর্মের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানে মেনে নেওয়া হয়েছে। সব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য মুছে ফেলে যে ঐক্য সেই ঐক্য গুরুতর মতভেদ ডেকে আনে। ভিতরে ভিতরে এমন ভাঙন ধরে যে দেশ চৌচির হয়ে যেতে পারে। অন্তরের মিলটাই আসল। সকলের অন্তরে যদি থাকে একই ইমোশন তাহলে তারা হবে একই নেশন। বাইরের ইউনিফর্ম দিয়ে একদল সৈন্য তৈরি হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে এক নেশন হবে না। দেশভাগের থেকে এই শিক্ষাই আমি লাভ করেছি যে বৈচিত্র্যও ঐক্যের চেয়ে কম সত্য নয়। বাটখারার দুই পাল্লার ভারসাম্য রক্ষা করাই বিজ্ঞতা।

দ্বিধাদীর্ণ মানস

পাঁচ পুরুষ পূর্বে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। তখন থেকেই আমাদের শিক্ষিত মহলের রাজনৈতিক চিন্তা দ্বিধাদীর্ণ। এক ভাগের আদর্শ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী ও তার ধাপে ধাপে বিবর্তন। আরেক ভাগের আদর্শ ফরাসী বিপ্লব ও তার রক্তাক্ত উন্মাদনা।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের অল্পদিন পরে টমাস পেইনের 'যুক্তির যুগ' কলকাতার বন্দরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এক টাকা দামের বই পাঁচ টাকায় বিকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। তখনকার পক্ষে ও বই ছিল দারুণ বৈপ্লবিক। এখানকার দিনে মাও ৎসে-তুং মহোদয়ের চিন্তার মতো। সমান জনপ্রিয় ছিল টমাস পেইনের 'মানুষের অধিকার'।

ডিরোজিওর ছাত্ররা এ সব বই পড়তেন। শুধু এ সব বই নয়, ভলতেয়ার, হিউম, লক ইত্যাদির লেখাও। এমনি করে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার দুটি ফসলই বাংলার মনের মাটিতে আবাদ হতে শুরু করে। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ চিন্তাশীলই ইংলণ্ডের মতো পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর ভক্ত।

এখানে বলে রাখতে চাই যে, ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকের নায়করাও ছিলেন ইংলণ্ডের মতো একটি সংবিধানের অনুরাগী। যে সংবিধান রাজাকেও রাখে মাথার উপরে। যাজক ও অভিজাতদেরও রাখে সাধারণের সঙ্গে। রাজার মাথা কাটা জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া যাজকদের সঙ্ঘটাকেই অস্বীকার করা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। ঘটনাচক্র কিন্তু সেই দিকেই ঘূর্ণিত হয়। ঘটনার পিঠে সওয়ার হয়ে বসেন আরেক দল নায়ক, পরে আরো একদল। তখন দেখা গেল ফরাসীরা আর ইংরেজদের অনুগমন করছে না। করছে রুশো ভলতেয়ার দিদেরো প্রভৃতি ফরাসী ভাবুকদের। তখন সেটা বিপ্লবের মর্যাদা পায়।

বাংলাদেশের বিপ্লববাদী তরুণরা সরাসরি রুশো, ভলতেয়ার প্রমুখ ফরাসী চিন্তানায়কদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। বিপ্লবী তত্ত্বটা উপলব্ধি করে। কিন্তু তার কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে না। অপর পক্ষে যারা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিবর্তনের অনুরূপ কিছু চায় তারা আন্দোলন শুরু করে দেয়, যাতে আইনের শাসন,

সিভিল লিবার্টি, মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় ও তারা অংশীদার হয়।

কর্মকাণ্ডের অভাবে বহুকাল পর্যন্ত বিপ্লবী চিন্তা নিষ্ক্রিয় থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের দিনও তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। তবে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে দুজন বাঙালী ছাত্র তাদের কলেজ ম্যাগাজিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পিত কাহিনী লিখেছিল। সেটা নিছক ইংরেজবিরোধী। সামাজিক পরিবর্তনের আভাস ছিল না তাতে।

ফরাসী বিপ্লবের মূল সুরটি হল সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী বলে পুরুষানুক্রমিক কোনো শ্রেণী থাকবে না। না ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় না বৈশ্য। না অভিজাত, না বুর্জোয়া। ফরাসী বিপ্লব যখন হয় তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি অভিজাত বা যাজকশ্রেণীর তুলনায় অল্প ছিল। শিল্পবিপ্লব বলে আর একটি বিপ্লব এসে বুর্জোয়াদের বিত্ত বৈভব প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু বাড়িয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এদেশে শিল্পবিপ্লবের নামগন্ধ না থাকায় আমাদের বিপ্লবী চিন্তা বুর্জোয়া-বিরোধী ছিল না। ছিল অভিজাত ও যাজক-বিরোধী।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণ সভ্যরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপবীত বর্জন করেন। উপবীত বর্জন করে তাঁরা সন্ন্যাসী হন না। গৃহীই থাকেন। তাঁদের এই কর্মটি একপ্রকার বৈপ্লবিক কর্ম। মাঝখানে ফরাসী বিপ্লব না ঘটে থাকলেও সেই ভাব এদেশে পৌঁছে না থাকলে ও এদেশের চিত্তকে সরস না করে থাকলে ব্রাহ্মণ সন্তানরা উপবীত ত্যাগ করে শূদ্রের সঙ্গে বিবাহাদি করতেন না। এ শুধু অনুলোম বিবাহ নয়। প্রতিলোমও। কিন্তু দুই পক্ষই ব্রাহ্ম বলে অনুলোম প্রতিলোমের প্রশ্ন ওঠে না। বর্ণভেদই ওঁরা মানেন না। এরও উৎস ফরাসী বিপ্লব।

সমাজে শূদ্রের মহত্ত্ব বেড়ে যায়। ফরাসী দেশে চাকরকেও বলা হয় "আপনি"। এদেশে কেউ তত দূর না গেলেও "তুই' থেকে "তুমি" ক্রমশ চল হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ শূদ্রকে আশীর্বাদ করার অধিকারী ছিল, নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণও উৎকৃষ্ট শূদ্রের প্রণাম পাবার যোগ্য ছিল। এখনো সে মনোভাব সম্পূর্ণ দূর হয়নি। দূর হতো যদি ফরাসী বিপ্লব এদেশে ঘটে থাকত। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে বৈপ্লবিক তত্ত্বের হাওয়া লেগে হয়েছে। কর্মকাণ্ডের আঁচ লেগে হয়নি।

ফরাসী বিপ্লবে রক্তপাত প্রচুর ঘটেছিল বলে হঠাৎ মনে হতে পারে রক্তপাতটা বিপ্লব। তা নয়। বিপ্লব হচ্ছে চাকা ঘুরে যাওয়া। চক্রের আবর্তন বা রেভলিউশন। যেখানে চক্রের আবর্তন ঘটল না, ঘটল শুধু রক্তপাত সেখানে সেটা বিপ্লব নয়, সেটা মানুষের আদিম রক্তপিপাসার নিবৃত্তি। মৃত্তিকাকে উর্বরা করার জন্যে নরবলির রেওয়াজ কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে আছে। সভ্যজাতিও মাঝে মাঝে যুদ্ধের নামে নরবলি দেয়। বিপ্লবও তেমনি একটি আদিম ক্রিয়াকাণ্ড হতে পারে। চক্রাবর্তন নয়।

বিশ-ত্রিশ হাজার বা বিশ-ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণে মারলেই অমনি কোটি কোটি মানুষের জীবনধারা বদলে যায় এটা একটা কুসংস্কার। বৈজ্ঞানিক চিন্তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের ও এই কুসংস্কার রক্তপাতের নিরিখে প্রগতির হিসাব করেছিল।

ফরাসী বিপ্লবের নায়করা যা চেয়েছিলেন তার জন্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ও তার উপর কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রই ছিল তাঁদের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের অক্ষ। যেখানে রাষ্ট্র নেই বা তার উপর এক্তার নেই সেখানে সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে না। কারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপবীত বর্জনের মতো সৎসাহস সকলের নেই, থাকলেও তার সীমা আছে। অপর পক্ষে রাষ্ট্র তার দণ্ডনীতির প্রয়োগে ঘোরতর ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর সে পরিবর্তন বৈপ্লবিক হতে পারে।

রাষ্ট্র আমাদর হাতে ছিল না। কোনো দিন আসবে এটা ভাবতেও পারা যেত না। রাষ্ট্রকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে কত দূর যাওয়া যায় সেইটেই ছিল আমাদের চিন্তাশীলদের ধ্যান। ব্রাহ্মসমাজ রাষ্ট্রের জন্যে অপেক্ষা না করে বর্ণভেদ রহিত করার চেষ্টা করেছে, তার নিজের পরিসরের ভিতরে পেরেছেও। তেমনি নরনারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাহ্মনারীদের মধ্যে একদল 'দেবী' ও একদল 'দাসী' ছিলেন না। ব্রাহ্মণবংশীয়া ব্রাহ্মিকাদের কেউ কেউ 'দেবী' ছিলেন তা ঠিক কিন্তু 'দাসী' একজনও না। তাঁরা পাশ্চাত্য প্রথায় স্বামীর বা পিতার পদবী ধারণ করেন। এটা পশ্চিমিয়ানা নয়। এটা সাম্যবাদের প্রয়োগ।

ওদিকে পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর প্রবক্তাদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজের হাতে থাকে থাকুক প্রজার অধিকার যেন ভারতীয়দের হাতে থাকে। তারা যেন আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তাঁরা যেন হন

নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁদের যেন সমালোচনার অধিকার থাকে, থাকে রদবদল করার অধিকার, পার্লামেণ্টারি অপোজিশনের অধিকার থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তাও রাষ্ট্রনির্ভর বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হয়।

বলা যেতে পারে দুই চিন্তাস্রোতই রাষ্ট্রাভিমুখ। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পার্লামেণ্টারি ভাবধারার বাহক। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠামূলেও ছিল সেই ভাবধারার সিঞ্চন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসুক না আসুক পার্লামেণ্টজাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান যদি প্রবর্তিত হয় আর সেখানে গিয়ে যদি আইন রদবদল করার অধিকার লাভ করা যায় তবে সেটাই বা কম কিসে?

ওদিকে ফরাসী বিপ্লবের পর বৈপ্লবিক ভাবধারা নানা খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। সিণ্ডিকালিস্ট ও অ্যানারকিস্টরা রাষ্ট্র নামক একটা সংস্থার প্রয়োজনই দেখতেন না। বিপ্লবের কাজ হবে রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করা নয়, ভেঙে খান খান করা। মার্কসবাদীরা কিন্তু রাষ্ট্রকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন, অথচ বলতেন রাষ্ট্র ক্রমে শুকিয়ে যাবে।

রাষ্ট্র আদৌ থাকবে কি থাকবে না? থাকলে তার উপর কোনো অঙ্কুশ থাকবে কি থাকবে না? শাসকদের সংযত করার জন্যে কোন চেক বা ব্যালান্স থাকবে কি থাকবে না? বিকল্প সরকার গঠন করার আশা নিয়ে কোনো অপোজিশন থাকবে কি থাকবে না? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখা গেল বিপ্লবীদের নিজেদের শিবিরই চৌচির। পশ্চিম ইউরোপের মার্কসবাদীরা তো রাষ্ট্র বলে একটি সংস্থাকে কায়েম রাখতে চাইলেনই, উপরন্তু পার্লামেণ্টকেও মন্দের ভালো বলে মেনে নিলেন। ডিক্টেটরশিপের আওয়াজ তাঁদের প্রাণে পুলক সঞ্চার করল না। যাদের ডিক্টেটরশিপ সেই শ্রমিকশ্রেণীও যে ডিক্টেটর বলে একজনকে বা একদল লোককে পছন্দ করল তাও নয়।

ইতিহাস যে ধারায় চলছিল সে ধারায় চলতে থাকলে কোনো কালেই মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটত না। ঘটলে ঘটত ফরাসী বিপ্লবের মতো এক বিপ্লব। যাতে প্রাইভেট প্রপার্টি একেবারে রহিত হতো না, চাষী ও কারিগরিশ্রেণীও ও জিনিস ছাড়ত না, কেউ তাদের ছাড়তে বাধ্যও করত না। গেলে যেত ধনীদের সম্পত্তি। সর্বশ্রেণীর নয়। আর লিবার্টির মূল্য অতি সাধারণ লোকও মনে প্রাণে বুঝত। সহজে ও জিনিস হাতছাড়া হতে দিত না। দিলেও ফিরে পেত। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ডিক্টেটরশিপ পশ্চিম ইউরোপের জনমতের কাছে

অকল্পনীয়। ভোট তাদের বিচারে তুচ্ছ একটা পদার্থ নয়। সেটা তাদের জন্মস্বত্ব।

কেউ ভাবতে পারেনি যে মার্কসের শিষ্য হবেন লেনিন ও বিপ্লবের দুয়ার খুলে যাবে ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে। মার্কস সেরকম কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। তাঁর মতে সেই দেশেই বিপ্লব ঘটবে যে দেশ শিল্পবিপ্লবে যথেষ্ট অগ্রসর, যেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান। অর্ধসভ্য রুশ দেশের অর্ধচেতন শ্রমিক-কৃষক হঠাৎ একদিন মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটাবে এমনতর স্বপ্ন স্বয়ং মার্কস মুনিও দেখেন নি।

অথচ ফরাসী বিপ্লবের কল্যাণে রুশ দেশেও বিপ্লবচিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকেই প্রবাহিত হচ্ছিল। যাদের মধ্যে হচ্ছিল তারা শ্রমিক-কৃষক নয়। আর তাদের লক্ষ্য শ্রমিক-কৃষকের ডিক্টেটরশিপও নয়। ফরাসী বিপ্লবের জের টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। স্বৈরাচারী সম্রাট থাকবেন না, অথচ রাষ্ট্র থাকবে। রক্ষণশীল যাজককুল থাকবে না, অথচ চার্চ থাকবে। সুবিধাভোগী অভিজাতশ্রেণী থাকবে না, অথচ মধ্যবিত্তশ্রেণী থাকবে। প্রাইভেট প্রপার্টি একেবারে লোপ পাবে না; জমি ভাগ করে দেওয়া হবে। সমাজে সার্ফ বলে কেউ থাকবে না, সার্ফদের মুক্তি দিতে হবে। দেশকে শিল্পায়িত করতে হবে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর আদিপর্বের বিপ্লবীরা যা চেয়েছিলেন তা যদি বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে পেতেন তা হলে আর কোনোদিন ওদেশে বিপ্লবের নাম শোনা যেত না। কিন্তু বার বার বিপ্লব-প্রয়াস করেও সম্রাটের কাছ থেকে সার্ফের মুক্তি ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কোনো দান পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের মধ্যে এল নিহিলিস্ট চিন্তা, অ্যানারকিস্ট চিন্তা। কিছুই তাঁরা মানবেন না, কিছুই তাঁরা রাখবেন না। এমন কি পরিবারও না, পারিবারিক বন্ধনও না। এমন কি ঈশ্বরও না, পরলোকও না, পরকালের পরিত্রাতাও না। পশ্চিম ইউরোপকেও তাঁরা এদিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন।

শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও তাঁরা নতুন নতুন লাইন খুলে দিলেন। খুন, লুট, ধ্বংস। প্রধানত তরুণতরুণীরাই এ সব করে বেড়াতে। নিহিলিস্ট বা অ্যানারকিস্ট বলতে মানুষের মনে যে ছবি আঁকা হয়ে যায় তা এমন একজন বা একদল আদর্শবাদী, যার কাছে বা যাদের কাছে প্রাণের মূল্য নেই, সম্পত্তির মূল্য নেই। এমন কি অতীতেরও মূল্য নেই। ওরা দেশের

অতীতটাকে মুছে ফেলবে আর মুছে ফেলা স্লেটের উপরে ভবিষ্যতের লিখন লিখবে।

বিপ্লবী চিন্তায় রুশ দেশের এই অধ্যায়টার ছাপ পড়ে একে আশ্চর্য এক মহিমা দেয়। এ যেন এক নতুন ধর্ম সংস্থাপনের উদ্যোগ। যার জন্যে পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার। ফরাসী বিপ্লবেও অতীতকে বিদায় দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সেটা যতটা ভাবাবেগের সঙ্গে ততটা ধর্মপ্রাণতার সঙ্গে নয়। রুশো ভলতেয়ার ধর্মপ্রাণ ছিলেন না খ্রীস্টান বা অখ্রীস্টান কোনো অর্থেই। ওটা ছিল যুক্তির যুগ। রুশো অবশ্য বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ছিলেন না কিন্তু নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মানসিকতাও তাঁর ছিল না। রুশ দেশই সেই দেশ, যেখানে বিপ্লব-প্রয়াসের ভিতর ছিল ধর্মপ্রবর্তনের উৎসাহ উদ্দীপনা।

এমনও হতে পারে যে, প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধবিগ্রহে শ্রান্ত ক্লান্ত পশ্চিম ইউরোপ আবার এক ধর্মের নামে নাচতে রাজী ছিল না। বলা বাহুল্য, রুশ বিপ্লবীরাও খ্রীস্টধর্মের মতো আর একটি ধর্ম চাননি। যা চেয়েছিলেন তা ধর্মের মতো জীবনের সমস্তটাকেই রূপান্তরিত করতে পারে। বিপ্লবই সেই প্রার্থনীয় সোনার কাঠি।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হলো তাঁরা লেনিনপূর্ব বিপ্লবী। লেনিন এসে বিপ্লবকে একটা বৈজ্ঞানিক মোড় দেন। তার সংযোগ ঘটান ইউরোপীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে। বিশেষ করে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে। কিন্তু তিনিও তো জন্মত রুশ। রুশ ঐতিহ্যই বা তিনি এড়াবেন কী করে? লেনিনের বিপ্লব রুশ দেশেই সম্ভব ছিল, অন্যত্র নয়। অথচ মার্কসবাদী শিক্ষা ব্যতীত কোথাও তেমন বিপ্লব ঘটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। লেনিনের মধ্যে এমন এক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় যা তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর সাফল্যের কারণ তাঁর জীবনের দুটি মহৎ প্রভাবের মাঝখানে মেলবন্ধন।

লেনিনের সিদ্ধি সারা দেশের ও সারা যুগের বিপ্লবীসাধনার সিদ্ধি। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সিদ্ধির ভিতরেই ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল। রুশ দেশের পূর্বতন বিপ্লবীরা কেউ বা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রহীন সমাজ, কেউ বা চেয়েছিলেন সর্বেসর্বাহীন রাষ্ট্র! তাদের প্রাণদান কি এইজন্যে যে রাষ্ট্র দিনকের দিন ফুলে ফেঁপে উঠবে, কোনদিন শুকিয়ে যাবার নাম করবে না, তার পিঠে সওয়ার হয়ে যে দলটি বসবে সে আর সবাইকে নির্মূল করবে, সে আর

সকলের উপর অঙ্কুশ চালাবে, তার উপরে আর কেউ অঙ্কুশ চালাবে না, সরকার থাকবে, কিন্তু অপোজিশন থাকবে না, ভোট দিয়ে প্রত্যেকবারেই দেখা যাবে যে ওই একটিই দল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারদের মতো ঘাড়ে চেপে বসে আছে ?

সামাজিক পরিবর্তন নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু মানুষের কতকগুলো মৌল অধিকার আছে, সেগুলো না থাকলে জীবন বিস্বাদ। মানুষ কেবল খেয়ে পরে বাঁচে না। তার চাই সর্বপ্রকার স্বাধীনতা। তার চাই সর্বতোমুখ চরিতার্থতা। ফরাসী বিপ্লবের সুরে বাঁধা বিপ্লব ছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সুরে বাঁধা। সেই ধরনের বিপ্লব যারা চেয়েছিল ও তার জন্যে মরেছিল তা শ্রেণীহীন ব্যবস্থার জন্যে আর সব কিছু বলি দিতে চায়নি। প্রাইভেট প্রপার্টি লোপ করতে গিয়ে আর সব কিছু বিসর্জন দিতে চায়নি।

এমন কি লেনিনের সহকর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ততদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই স্টালিনের সঙ্গে মতান্তর হয় ও তাঁদের জান যায়। স্টালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়া লেনিনের সঙ্গে আবার পা মিলিয়ে নিতেও চেষ্টা করছে। কতদূর পারবে বলা যায় না। তাকেও একদিন গণতান্ত্রিক মুল্যগুলোর অনুরাগী হতে হবে। নইলে তার সমাজতন্ত্র মানুষকে মানবিক উত্তরাধিকার থেকে বহু পরিমাণে বঞ্চিত করবে। ফরাসী বিপ্লব যেটা চায়নি।

রুশ বিপ্লবের বার্তা এদেশে পৌছবার আগে যারা বিপ্লবী চিন্তায় দীক্ষিত ছিলেন তাঁরা ওই ফরাসী বিপ্লবের ধারায় অভিষিক্ত ছিলেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় লিখেছেন, তাঁর প্রথম বয়সে বাংলার শিক্ষিত মহলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছিল। সেটা স্বদেশী যুগের পূর্বতন যুগ। ততদিনে ফরাসী বিপ্লব তার আদি রূপের থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তার উপর কাজ করেছে তার পরবর্তীকালের শিল্পবিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। নানা শাখা প্রশাখা উদ্গত হয়েছে। সোশিয়ালিজম, সিণ্ডিক্যালিজম, অ্যানারকিজম, নিহিলিজম। এক সোশিয়ালিজমেরই কতরকম প্রশাখা। তার মধ্যে মার্কসিজমও পড়ে। কিন্তু বাংলা দেশে অতরকম ডালপালা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায়নি। অন্তত মার্কসবাদের নামগন্ধও পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার সঙ্গে তুলনায় এদেশ অনেকটা পেছিয়ে রয়েছিল। অথচ রাশিয়ার হাওয়া এখানেও লেগেছিল। নিহিলিজম ও অ্যানারকিজম হাওয়ায় ভেসে এসেছিল। তার থেকেই আসে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদ।

বাংলার সন্ত্রাসবাদের পেছনে বাংলার ধর্মসাধনাও ছিল, তাই এর তত্ত্বের দিকটা ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নায়করা কেউ 'আনন্দমঠ' বর্ণিত সমাজে ফিরে যেতে চায়নি, চেয়েছিল আধুনিক যুগের সমাজ। সে সমাজে সাম্য আছে, স্বাধীনতা আছে, জ্ঞানবিজ্ঞান আছে, নরনারীর রোমান্টিক প্রেম আছে, ঘরে ও বাইরে সাহচর্য আছে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উনবিংশ শতাব্দীর আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

আমাদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা রুশ দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনুরূপ না হলেও বেশ কিছুটা কাছাকাছি ছিলেন। তাই একদিন দেখা গেল তাঁরা ন্যাশনালিজম নামক একটি ধর্মমত ছেড়ে কমিউনিজম নামক আর একটি ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নিলে ভেক বদলেও যায়। এঁদের বেলাও তাই হয়। বিপ্লব ঘটল না, অথচ শত শত যুবকযুবতীর জীবনের রূপান্তর ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা দ্বীপান্তর থেকেও ছাড়া পেলেন। কিংবা বন্দীনিবাস থেকে। এঁদের মুখে মার্কসবাদের নবতম বোলচাল শুনে ভ্রম হয় আমরাও হয়তো স্টালিনের রামরাজত্বে বাস করছি বা করতে যাচ্ছি। শুধু একটা বিপ্লবের অপেক্ষা।

তবে মনটা হালকা হয় এই ভেবে যে আর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ হবে না, আর সাহেব খুন বাঙালী খুন হবে না। যেটা হবে সেটা অবিকল রাশিয়ার আদলে। সেটা তো গোড়ায় তেমন রক্তক্ষয়ী ছিল না। ওদিকে বিপ্লব কথাটার এমন মাহাত্ম্য যে মহাত্মার শিষ্যরাও অহিংস বিপ্লবের ধুয়ো ধরেছেন। জবাহরলালজী তো হাঁকছেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তা শুনে আমরা সত্য সত্য বিশ্বাস করছি যে উনিই আমাদের লেনিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ভারতীয় লেনিনের পলিসি দেখে বেশ টের পাওয়া গেল যে উনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের ক্রিপস ইত্যাদির মতো ফেবিয়ান পার্লামেণ্টারি সোশিয়ালিস্ট, তফাতের মধ্যে সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। জবাহরের চেয়েও গান্ধীকে ইংরেজ কর্তারা ভয় করতেন। কারণ যুদ্ধকালে গান্ধীর পলিসি ছিল লেনিনের মতো। পরে তো লেনিনকেও তিনি ছাড়িয়ে যান যুদ্ধের মাঝখানে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে।

গান্ধীজী মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে যুদ্ধকালে ইংরেজ রাজকে বড়ো রকম একটা ধাক্কা দেবেন। তাতে যদি ওরা টলে টলবে। না টললে

পরে আবার এক ধাক্কা। তার জন্যে তিনি চাইকি একশো বিশ বছর বেঁচে থাকবেন। ততদিন বাঁচবার দরকার হলো না। ইংরেজরাই মানে মানে চলে গেল। যাবার আগে হিন্দুর কান ধরিয়ে দিয়ে গেল মুসলমানের হাতে আর মুসলমানের কান হিন্দুর হাতে। এটাও একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। গান্ধীজীর আর বাঁচতে ইচ্ছা ছিল না। ঘাতকরা তাঁকে বাঁচতে দিলও না।

কিন্তু গান্ধীবাদ এমন একটা ধাক্কা খেল যে এখনো সামলে নিতে পারেনি। বিশেষ কেউ বিশ্বাস করে না যে এদেশে গান্ধীবাদী বিপ্লব একদিন ঘটবে। বিনোবাজী যে বিপ্লবের কথা বলছেন তা ফরাসী বিপ্লবের বা রুশ বিপ্লবের সঙ্গে মেলে না। ইউরোপীয় বিপ্লবচিন্তার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে বিপ্লব, সৈন্যদলকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র, মালিকানা বাদ দিয়ে জমির বণ্টন, দান খয়রাতের মাধ্যমে হস্তান্তর এসব লোকের মনে বসতে কে জানে কতকাল লাগবে। জনগণ ততদিন সবুর করলে হয়।

কাজেই বিপ্লবের কথা যারা বলে তারা হয় জবাহরলালের মতো ফেবিয়ান পার্লামেণ্টারি সোশিয়ালিস্ট, না হয় সরাসরি মার্কসিস্ট। ইতিমধ্যে মার্কসিস্টদের মধ্যেও বিভিন্ন মত। তাঁদের একদল তো কিছুতেই পার্লামেণ্টারি প্রথা অনুসরণ করবেন না। সেটা তাঁদের মতে বিপথ। অথচ তাঁরা ধৈর্য ধরে লেনিনের মতো অপেক্ষাও করবেন না। যতদিন না পরিস্থিতি বিপ্লবের অনুকূল হয়। তাঁরা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবেন। জনগণ যদি তার জন্য তৈরি না থাকে তাঁরা ছাত্রগণকে নিয়েই কাজ করবেন। আর ছাত্রদের হাতে যদি রাজ্যপাট জোর করে দখল করার মতো লোকবল বা অস্ত্রবল না থাকে তবে ছোরা ছুরি বোমা পটকা পেট্রোল কেরোসিন তো আছে। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং সমাজবিরোধী অপরাধপ্রবণ শ্রেণীকেও বিপ্লবের শিবিরভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। মার্কসের বা লেনিনের কোথাও এর নজীর নেই। যতদূর জানি মহামান্য মাও ৎসে-তুং যতরকম উপায় অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে এরকম কিছু নেই। থাকতে পারে দক্ষিণ আমেরিকার সন্ত্রাসবাদীদের কর্মপ্রকরণে।

পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ত্বরিত সামাজিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। পার্লামেণ্টে হাজার রকম তর্কবিতর্ক, আদালতে হাজারটা কূটপ্রশ্নের অবতারণা, আমলাতন্ত্রের অন্তহীন টালবাহনা ও গাফিলতি, পদে পদে টাকার শ্রাদ্ধ। তরুণ মন যদি হতাশায় ভরে যায় তাকে দোষ দেওয়া শক্ত। অপর পক্ষে জনগণ যদি বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত না থাকেন, সৈন্যরা যদি বিপ্লবীদের পক্ষে

যেতে ইচ্ছুক না হয়, যুদ্ধবিগ্রহ এসে পরিস্থিতিকে যদি পাকিয়ে না তোলে তাহলে লেনিন বা মাও বা চে গেভারা কারো সাধ্য নেই বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের পিঠে সওয়ার হয়ে বসার। বিপ্লব নৈর্ব্যক্তিক একটি শক্তি। ব্যক্তি-বিশেষ যত বড়োই হোন সময়ের একদিন আগে বিপ্লব ঘটাতে পারেন না। যেমন সময়ের একদিন আগে ভূমিকম্প ঘটাতে পারেন না। লেনিনের ছিল অসাধারণ সময়জ্ঞান। তেমনি গান্ধীজীরও। যাঁদের যে রকম সময়জ্ঞান নেই তাঁরা থেকে থেকে ধর্মঘটের বা 'বন্‌ধ'এর ডাক দিয়ে লোকের সহানুভূতি খোয়াবেন।

"বাঘ" "বাঘ" বলে ডাক দিলেই বাঘ এসে হাজির হয় না। সত্যি যখন আসে তখন কেউ তার জন্যে তৈরি থাকেন না। বাঘ একদিন আসতে পারে আমিও সেটা জানি। রুশ দেশের সঙ্গে চীন দেশের সঙ্গে ভারতের যতখানি মিল আছে ইংলণ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে ততখানি নয়। অধিকাংশ লোক এত গরীব যে তাদের হারাবার কিছু নেই বিপ্লবে। হারাবার যদি কিছু থাকে তো সেটা তাদের শিকল। তবে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের কল্যাণে শিকলও কি আর আগেকার মতো ?

স্বাধীন ভারত আর কিছু না পারুক পায়ের শিকল খুলে দিয়েছে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারেনি। এত বেশী ভিখারী বা কুষ্ঠরোগী আর কোন দেশে আছে ? আর এত বেশী বেকার ? এত বেশী অলস মানুষ ? আলস্যই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। জমি বণ্টন করার পর দেখা যাবে আলস্যের দরুণ উৎপাদন বাড়ছে না। বিরাট এক অলস শ্রেণী হচ্ছে এদেশের ছাত্ররা। এদের কাজে লাগাতে না জানলে এরা অকাজই করবে। একে মারবে, ওর ঘর পোড়াবে, তার মূর্তি ভাঙবে। অকাজ হলেও তবু কাজের মতো দেখতে। এই নিয়ে তো বেশ ব্যাপৃত থাকা যায়।

আমি গোড়াতেই বলেছি যে গত শতাব্দীর নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে একদল ফরাসী বিপ্লবীদের চিন্তাপ্রবাহে অভিষিক্ত হন, একদল পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর বিবর্তনস্রোতে। সেই দুটো ধারা এখনো আমাদের শিক্ষিত মানসে সঞ্চারিত রয়েছে। এর কোন শ্রেণীভেদ নেই। এমন নয় যে মধ্যবিত্ত বাবুরাই পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীমনস্ক আর মজদুর চাষীরাই বিপ্লবমনস্ক। প্রত্যেক শ্রেণীতেই দু' মত। প্রত্যেক পরিবারেই দু' মত। এমন কি প্রত্যেকটি ব্যক্তিই দ্বিধাদীর্ণ। ওদিকে হাইকোর্টে যাওয়া হচ্ছে, এদিকে

খুনোখুনিও করা হচ্ছে। সবাই জানে যে কোর্ট না থাকলে কেউ বাঁচবে না, সমাজবিরোধীরা সবাইকে মেরে সাবাড় করবে। অথচ জজকেই খুন করে রাখবে।

অশিক্ষিতদের চেয়ে শিক্ষিতদের নিয়েই ভাবনা বেশী। এদের শিক্ষাই এদের কুশিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভালো। অথচ কার সাধ্য এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দেয়! সেক্ষেত্রে কতরকম কায়েমী স্বার্থের সমাবেশ ঘটেছে। সত্যিকার বিপ্লবী আঙুলে গোনা যায়। লেনিন কিংবা মাও যদি এদেশে জন্মান এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় হাত দিতে পারবেন না। সেই জন্যই কি বিশেষ একটি দল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ধ্বংস করার ব্রত নিয়েছে? তাতে কিন্তু সত্যিকারের বিদ্যানুরাগীদের সর্বনাশ হচ্ছে। পরের জেনারেশনে ইনটেলেকচুয়াল বলতে একটিও থাকবে না মার্কস কি এই চেয়েছিলেন?

তবে মাও বোধ হয় এইরকমই চান। তিনি কায়িক পরিশ্রমে আরো বেশী বিশ্বাস করেন। পারলে লাঙলে জুতে চাষ করাবেন এইসব মধ্যবিত্ত সমাজের পড়ুয়াদের। তাতে স্পষ্টত কিছু উৎপাদন বাড়বে। অন্তত আপনার খোরাকটা এরা আপনি ফলিয়ে নেবে। চাষীদের দিয়ে ফলাতে হবে না। দেশে মাও রাজত্ব প্রবর্তন হলে মধ্যবিত্ত বংশধরদের হলধর হতে হবে, এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয় তো কী? কিন্তু তার জন্যে আপনার লোককে এরকম বেপোরোয়াভাবে খুন করার দরকারটা কী?

এদেশে দারিদ্র্য আছে, আলস্য আছে, কুশিক্ষা আছে, অশিক্ষা আছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে যা আছে তা গত পাঁচ পুরুষের নব শিক্ষা, তিনপুরুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দু' পুরুষের গান্ধীবাদী সাধনা, এক পুরুষের পার্লামেণ্টারি অভিজ্ঞতা। রুশ বা চীনদেশের কি এর সঙ্গে তুলনীয় কিছু ছিল? কতকগুলি বিষয়ে আমরা রুশ চীনের সগোত্র হলেও আবার কতকগুলি বিষয়ে ওদের থেকে ভিন্ন। বিপ্লব এদেশে হতেও পারে, না হতেও পারে। যাদের ত্যাগের উপর নির্ভর করে আমাদের বিপ্লবীরা ভবিষ্যৎ গণনা করছেন তারা যদি যথেষ্ট ত্যাগ না করে, করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়, তা হলে তো সে গণনা অভ্রান্ত নয়। গণনার মধ্যে প্রতিবিপ্লবীকেও ধরতে হবে।

এই সেদিন যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধিকাংশ দখল করেছেন মার্কসবাদী দল। এঁরা যদি বিভক্ত না

হয়ে একজোট হতেন তাহলে তো এঁরাই ক্ষমতার আসনে বসতেন। বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে হত কেন? যেহেতু ওঁরা সংখ্যাধিক হয়েও একজোট হতে পারলেন না সেহেতু ওঁরা বিপ্লবের পরেও পারবেন না। প্রতিবিপ্লবীকেই পথ ছেড়ে দেবেন। একমাত্র ভরসা সংখ্যালঘু হয়েও রাজত্বলাভ। সেটা হয়তো গায়ের জোরে সম্ভব, কিন্তু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বজায় থাকতে তার সম্ভাবনা কতটুকু? অবশ্য সে গণতন্ত্র যদি সমস্তক্ষণ কর্মতৎপর হয়। কথায় নয় কাজে জনগণের আস্থা অর্জন করে।

বাঙালীদের সব চেয়ে বেশী মিল রুশদের সঙ্গেও নয় চীনদের সঙ্গেও নয়, ইংরেজদের সঙ্গে তো নয়ই। ফরাসীদের সঙ্গে। সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ফরাসীদের মানস দ্বিধাদীর্ণ। বিপ্লবের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে, তার তুলনায় আর সবকিছু বিস্বাদ। অথচ বার বার বিপ্লবে নেমে দেখা গেছে প্রাণ দেওয়াই সার। বিপ্লব স্থায়ী হয়নি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ হয়নি। প্রতিবিপ্লব এসে তার ঘুরে যাওয়া চাকা আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু লাভ সময়ের ধোপে টিকেছে। ফরাসীদের আধখানা মন তাই বিপ্লবের ভাবনায় ভরপুর।

বাকী আধখানা পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসী মেনে নিয়েছে। মেনে নিলে কী হবে? চালাতে জানা চাই। অসংখ্য দল। জোড়াতালি সরকার। গত এক শতাব্দীর মধ্যে পঁচাত্তর বছরই কেটে গেল বছর বছর জোড়াতালি সরকার বদল করে করে। মাসে মাসেও বদলেছে। এমন কি কয়েকদিন অন্তর অন্তর। ফরাসীরা অবশেষে এমন একজনকে নেতারূপে পায় যিনি শুধু পার্লামেন্টের নেতা নন, সৈন্যদলের নেতা, সেই সঙ্গে জাতির নেতা। কিন্তু দ্য গল তো চিরন্তন নন। তেমনটি কি পাঁচ দশ বছর অন্তর অন্তর পাওয়া যায়? তাই ফরাসীদের সমস্যার এখনো কোন স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

তা সত্ত্বেও ওদের ঘোরতর অসুবিধা হচ্ছে না ও হবে না। কারণ ওদের সিভিল সার্ভিস আর সৈন্যদল দুটোই খুব মজবুত। আর ওদের সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত সজাগ। আর ওদের ইনটেলেকচুয়ালদের সম্মান ইংলণ্ডের অভিজাতদের সঙ্গে তুলনীয়। ফরাসী বিপ্লব ইংলণ্ডের অভিজাততন্ত্রকে বরাবরের মতো নির্জীব করেছে। তার স্থান নিয়েছে জ্ঞানীগুণীতন্ত্র। ফরাসী আকাদেমির চল্লিশ জন অমরের মর্যাদা চল্লিশ জন ডিউক বা মারকুইসের চেয়ে উচ্চতর। ফরাসী বিপ্লব যেমন এক হাতে অভিজাততন্ত্রকে ধ্বংস করেছে তেমনি আর এক হাতে নতুন

এক অভিজাততন্ত্র সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া কি তা পেরেছে? আর চীন?

নিছক ভাঙনের নেশায় যাদের পেয়ে বসেছে তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা সশরীরে উচ্ছেদ হলে সে শূন্যতা পূরণ করবার জন্যে আর কোনো শ্রেণীই থাকবে না? লাইব্রেরী যদি পোড়ানো হয়, বইয়ের দোকানে যদি আগুন ধরানো হয়, মিউজিয়াম যদি বিধ্বস্ত হয় স্টুডিও যদি ভগ্নস্তূপ হয় তবে একটা দেশের যত ক্ষতি হয় আর একটা মহাযুদ্ধে তত ক্ষতি হয় না। মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা তাদের মহামূল্য শিল্পসামগ্রী-গুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে সযত্নে রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের কি দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরাপদে রাখার উপায় আছে? সংস্কৃতির উপরে জাতক্রোধ যারা তারা ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের উপরেও শনির দৃষ্টি দিয়েছে।

শ্রেণীশূন্য সমাজ বলতে কি এই কথা বোঝায় যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে নিয়ে সমাজকে নিঃক্ষত্রিয় করতে হবে? নিবু'র্জোয়া করতে হবে? দেখে শুনে মনে হয় একালের পরশুরামদের মনোগত অভিপ্রায় বুর্জোয়া বলে পরিচিত শ্রেণীটিকে কেবল জমিজমা কলকারখানা আপিস আদালত দোকান বাজার থেকে নয় ইহলোক থেকে অপসারিত করা। বিপ্লব মানে নিঃক্ষত্রিয়করণ। বার বার একুশ বার হলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। মাও মহোদয় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটালেন সেটাও তো দ্বিতীয় দফা নিঃক্ষত্রিয়করণ। এর পরে হয়তো তৃতীয় দফা আসবে।

অমন দফাওয়ারি নিঃক্ষত্রিয়করণ সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটেনি। ওরা বরং নিঃশূদ্রীকরণ করেছে। কুলাকদের যদি শূদ্র বলে ধরি। বেচারিরা সংস্কৃতির ধারও ধারত না। তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেল। নিঃশূদ্রীকরণের পর্ব তার চেয়ে বেশীদূর যায়নি। তবে ওদেশের পরশুরামদের অনেকের নিষ্পরশুরামীকরণ হয়েছে। স্টালিন তাঁর কমরেডদের অধিকাংশকেই সাবাড় করেছেন।

কাজেই পরশুরামদেরও একটু খেয়াল রাখা দরকার যে ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করার পর নির্মূলকারীদের পালা আসবে। তাদেরই কুঠার দিয়ে নিকাশ করা হবে। ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্‌ভাবিত গিলোটিনে যেমন বিপ্লবীদেরই পাইকারী হারে বিনাশ করা হয়। এই যে নিয়তি এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী মানুষকে স্বর্গ এনে দিতে পারে না, কিন্তু হত্যা-

বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচায়। একটি প্রাণকে এত মূল্যবান মনে করে যে তাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর আগে বাঁচাবার জন্যে একশো রকম সুযোগ দেয়। সেইজন্যে হাজার-জন খুনীর মধ্যে একজনেরও ফাঁসী হয় কি না সন্দেহ! ফাঁসীর হুকুম হলেও হাইকোর্ট রদ করে দেয় বা সরকার ক্ষমা করে লঘুদণ্ড দেন। ডেমক্রাসীর মতো বিচার বিবেচনা কার। দয়ামায়াই বা কার!

(১৯০১)

এক পুরুষ ফাঁক

কথাটা 'জেনারেশন গ্যাপ'। আমি তার তর্জমা করেছি 'এক পুরুষ ফাঁক'। এটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা ইচ্ছামতো তর্জমা করে নিতে পারেন।

কথাটা যাই হোক না কেন ব্যাপারটা হলো এই যে আমাদের সঙ্গে আমাদের তরুণদের স্বাভাবিক মতভেদ ইতিমধ্যে এতদূর গড়িয়েছে যে কেউ কারো ভাষা বোঝে না, বোধ হয় বুঝতেও পারে না। এ যেন দুই বধিরের কথোপকথন।

মতভেদ স্বাভাবিক। আজকের দিনে মতবাদ ভিন্ন হলেও কেউ আশ্চর্য হয় না। হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে বড়োদের সঙ্গে ছোটদের কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। কথাবার্তার জন্যে উভয়পক্ষের বোধগম্য ভাষারই অভাব।

আমরা বড়োরা যদি ছোটদের ভাষা বুঝতে পারতুম তাহলে ওরা আমাদের বোমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইত না। যারা বোমা দিয়ে বোঝাতে চায় না তারাও এমন বিচিত্র ব্যবহার করে যে, হয় ওরা অবুঝ, নয় আমরা অবুঝ।

এই 'জেনারেশন গ্যাপ' শুধু যে এই দেশেই লক্ষ করা যাচ্ছে তা নয়। দুনিয়ার বহু দেশেই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধনীর দেশেও যে 'এক পুরুষের ফাঁক' নেই তা নয়। বরং কথাটা ধনীর দেশ থেকেই এসেছে। যাঁদের চোখ আছে তাঁরা নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করেছেন যে আমাদের দেশের ধনীর দুলালরাই সবচেয়ে বেপরোয়া। না মানে তারা গুরুশিষ্য সম্পর্ক, না পিতাপুত্র সম্পর্ক, না জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ সম্পর্ক। বামপন্থার যেটা চরমতম রূপ তাতেও তারা অগ্রণী। আবার সমাজবিরোধী কর্মেও তারাই সবচেয়ে অগ্রসর। ডাকাতকেও তারা ডাকাতি শেখাতে পারে এমন বিদ্বান! একদিন হয়তো ফাসিস্ট হতেও তাদের বাধবে না।

সমাজ থেকে সৎঅসৎ জ্ঞান যদি লোপ পায়, একজন অন্যায় করছে বলে আরেকজনও যদি জেনে শুনে অন্যায় করে, জোর যার তারই ইচ্ছা যদি জয়ী হয়, জোট যার তারই জেদ যদি সফল হয়, শঠ যারা তারাই যদি শিরোপা পায়, তবে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তেমন সমাজ

ক্যাপিটালিস্ট না হয়ে কমিউনিস্ট হলেও কি বেশিদিন খাড়া থাকতে পারবে? সমাজবিরোধী অপরাধের মধ্য দিয়ে কখনো সত্যিকার সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে না। একদল মারে, আরেকদল মরে। কিন্তু যারা মারে তারাও বেঁচে থাকে না। আরো একদল এসে তাদেরও মারে। এই অন্তহীন হানাহানির পাপ হজম করতে বহু পুরুষ লেগে যায়। সাফল্য যে ধোপে টিকবেই এমন কী কথা আছে? সফল নেশনেরও বহু প্রতিদ্বন্দ্বী নেশন জোটে। বলপরীক্ষায় প্রতিবার জিৎ হবেই এমন কী নিশ্চয়তা আছে?

একালের ছেলেছোকরাদের মাথায় খুন চেপেছে। উদ্দেশ্য হয়তো মন্দ না, কিন্তু উপায় তো মন্দ। সকলেই যদি মন্দ উপায় অবলম্বন করে সকলেই বিড়ম্বিত হবে। যার জন্যে এত পাপ সেই লক্ষ্য আরো দূরে সরে যাবে। সামাজিক ন্যায ব্যক্তিগত অন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পুলিশ যদি আদৌ না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে তাতে কি বিপ্লবীদের কাজ কিছু এগোয়? সেটা একটা ভ্রম। তেমনি মিলিটারি যদি না থাকে কিংবা থেকেও না থাকে তাতেও কি বিপ্লবীদের কিছু সুরাহা হয়? সেটাও আর একটা ভ্রম। পুলিশ না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট পুলিশ গড়ে উঠবে। মিলিটারি না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় হলে প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। তার আভাস কি আজকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? অরাজকতা বিপ্লবের প্রস্তুতী নয়। ফাসিবাদেরই প্রস্তুতি।

এ-রাজ্যের অবস্থা এমন হয়েছে যে পুলিশ যে-কোনদিন ফেল করতে পারে। মিলিটারি অবশ্য অত সহজে ফেল করবে না। কিন্তু আখেরে যা হবে তা ইন্দোনেশিয়ার অনুরূপ। আশ্চর্য হই একথা ভেবে যে আমাদের তরুণরা কেবল হিমালয়ের উত্তরদিকেই তাকায়, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-দক্ষিণদিকে তাকায় না। ইন্দোনেশিয়ার তরুণদেরও দৃষ্টি ছিল পশ্চিম-উত্তরদিকে নিবদ্ধ। কই, কেউ তো এল না ওদের বিপদের দিন ত্রাণ করতে?

ভারত সরকার কতদূর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কেউ তা জানে না। পরে কাদের হাতে ক্ষমতা পড়বে বলা যায় না। জার্মানীতে সংবিধানও ছিল, নির্বাচনও ছিল, কিন্তু হিটলারকে ভোটে জিতিয়ে দেবার পর দেখা গেল একে একে সব কিছু অচল। পার্লামেণ্ট থাকতেও পার্লামেণ্ট না থাকার সামিল, কারণ বারো বছরকাল তার কোনো অধিবেশনই হয়নি। আমাদের তরুণদের এসব জানা উচিত। ক্ষমতা যে দক্ষিণ মার্গে যাবে না এমন অভয় কে তাদের দিয়েছে?

আমাদের জনগণ কি জার্মানীর জনগণের চেয়ে আরো শিক্ষিত না আরো সেকুলার? ধর্মের নামে ভোট চাইলে এখনো তাদের অনেকেই ভোট দেবে।

প্রতিষ্ঠিত সংবিধানকে অমান্য করে, দুর্বল করে, ভেঙে চুরে যা হবে তা এতই ভয়ঙ্কর যে প্রগতিশীলমাত্রেরই উচিত ও-পথে না চলা। একদল দুঃসাহসী একটা ভুল পথে চললেই যে ওটা ঠিক হয়ে যাবে তা নয়। এই দিগ্‌ভ্রান্তদের শেখানো হচ্ছে যে অতীতের সন্ত্রাসবাদীরাই নাকি ইংরেজকে হারিয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল। একটা অসত্য দিয়ে আরেকটা অসত্যকে সমর্থন করতে গেলে যা হবার তা হবেই। দুই পক্ষেরই কতকগুলি অমূল্য প্রাণ অকালে ও অকারণে বিনষ্ট হবে। পরে সন্ত্রাসবাদী অধ্যায়ের মতো এ-অধ্যায়েরও শেষ হবে।

বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য

এই মর্মে অভিযোগ উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা ওপার বাঙলার মানুষের জন্যে যেমন দরদে আত্মহারা হয়েছেন এপার বাঙলার মানুষের জন্যে তেমন মুখর নন। এপারে কি অনর্থ ঘটছে না? তাহলে এত উপেক্ষা কেন?

অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের হয়ে কথা বলার অধিকার আমাকে কেউ দেয়নি। তাঁদের বক্তব্য তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি শুধু আমার বক্তব্য বলি। কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে, বুদ্ধিজীবী শব্দটি আমার মনঃপূত নয়। ইংরেজিতে ইনটেলেকচুয়াল বলতে যা বোঝায় তা জীবিকার সঙ্গে বাঁধা নয়। যাঁরা বুদ্ধির অনুশীলন করেন তাঁরাই ইনটেলেকচুয়াল। জীবিকা তাঁদের যাই হোক না কেন।

বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে গত চব্বিশ বছরে কী ঘটেছে না ঘটেছে সে-বিষয়ে আমাদের কারো কোনো সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল না। আনুপূর্বিক বিবরণও আমরা কেউ জানতুম না। ঘরের ওদিককার দরজাটা একরকম বন্ধ ছিল। বিশেষত মিলিটারি ডিকটেটরশিপ শুরু হবার পর থেকে। শেষের দিকে এমন হয় যে চিঠিপত্র যায়-আসে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক ঘুরে। পত্রিকা তো একদম নিষিদ্ধ। রাশিয়ার লৌহযবনিকার কথা শুনেছি। সেটা কি এই বাঁশের যবনিকার চেয়ে দুর্ভেদ্য?

যেখানেই স্বাভাবিক যোগাযোগ দীর্ঘকাল রুদ্ধ হয় সেখানেই হঠাৎ অনবরুদ্ধ হলে আগ্রহের আতিশয্য ঘটে। এই কয়মাসের মধ্যেই সে-আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। জানবার যা তা আমরা একরকম জেনে গেছি। খুঁটিনাটি জানার বাকি আছে। বছরখানেকের মধ্যে সেটাও অজানা থাকবে না।

তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে পূর্ববাঙলা আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। পৃথিবীতে এমন নির্বাচন কখনো হয়নি। এমন অসহযোগও কখনো হয়নি। এমন গণহত্যাও এত কম সময়ের মধ্যে আর কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি। হিটলারের ইহুদীহত্যাও পর্যায়ক্রমে হয়েছিল বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে। তারপর এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই বা আর কোথায় ঘটেছে! পূব বাঙলা আমাদের শুধু স্তম্ভিত করেছে তা নয়, উল্লসিত করেছে,

বজ্রাহতও করেছে। হাঁ, এমন বিপুলসংখ্যক শরণার্থাই বা আর কোন দেশ থেকে পালিয়েছে? পূববাঙ্লার সামরিক শাসকদের অপশাসন আমাদের বেদনাবিহ্বল করেছে।

ইতিহাসের এটা একটা অভূতপূর্ব অধ্যায়। এ-অধ্যায় চিরস্মরণীয় হবে। আমরা যদি এর সম্বন্ধে নীরব থাকি তবে আমরাই ভাবীকালের কাছে কৃপার পাত্র হব।

বন্ধুরা একদিন এসে বলেন, "শেষ মুজিবুর রহমানকে ওরা নকল বিচারের পর নির্ঘাত বধ করবে। আমাদের কথার ফল কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবু কথা বলা আমাদের কর্তব্য। এটুকু যদি না করি তবে পরে মুখ দেখাব কী করে। মানুষের জন্যে মানুষের কি এইটুকুও করতে নেই।"

আমি অভিভূত হয়ে বলি, "অনেক আগে করা উচিত ছিল। আসুন, করা যাক।"

আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি। তবে ভুল হলো এইটুকু যে ময়দানে মিলিত হয়ে আবেদন করা হলো। ময়দান বুদ্ধিজীবীদের যথাস্থান নয়। সেখানে আমরা সমবেত হবার আগে আরো হাজার হাজার ছেলে-ছোকরা জড়ো হয়েছিল। শেখ মুজিবের জন্যে তাদের কারো চোখে জল বা মনে ব্যথা ছিল না। উদগ্র কৌতূহল চিত্রতারকাদের দেখতে। গাড়ি দেখলেই ওরা আটকায়। যখন দেখে তাদের প্রার্থিত মুখ তখন আনন্দে দিশাহারা হয়ে ছুটে আসে, ঘেরাও করে।

সে এক দৃশ্য! এবার আমি বাইরের লোকের মতো নয়, ভিতরের লোকের মতো দেখেছি। কারণ এখানকার একজন জনপ্রিয় চিত্রতারকার সঙ্গে একই গাড়িতে আমিও ছিলুম। যোগাযোগটা কাকতালীয়। আমাদের গাড়ি দেখে দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র জনতা জালের মতো গুটিয়ে আসে। আমরা যেন মাছ। তা দেখে চালকের যা দৌড়! সে তো সভয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। তারকা আর তাঁর স্বামীও সাহস পাচ্ছিলেন না। আমি বলি, "এত ভয় কিসের! চলুন, ওরা আপনাকে মারবে না। ওরা আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়।'

নামলুম আমরা। কিন্তু সামনে ক্যামেরার ভিড় দেখে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। তারকাকে ও তাঁর স্বামীকে নিরাপদ ভেবেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। ততক্ষণে বেশি দেরি হয়ে গেছে। সভাস্থলে তখন লোকারণ্য। ভিতরে ঢুকতেই পাইনে। এইরকম অবস্থা আরো অনেকের। পরে তারকা ও তাঁর

স্বামীকে না দেখে একটু উদ্বিগ্নই ছিলুম। জনতার শ্রদ্ধাও তো বিপত্তির কারণ হতে পারে। পরে জানা গেল পুলিশের কর্ডন তাঁদের রক্ষা করেছে।

তা হলে দেখুন, পুলিশ কত কাজে লাগে। আদরণীয়কে আদরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও পুলিশকে ডাক পড়ে। ছেলেদের এটুকু শিক্ষাও হয়নি যে নারীকে রক্ষা করতে তারা অনার-বাউণ্ড। আমারও শিক্ষা হলো যে নারীকে আমি না বুঝেসুঝে অভয় দিয়েছি। ওঁরা তো ফিরেই যাচ্ছিলেন, যেতে দিলে পুলিশ ডাকতে হত না। ভাগ্যিস পুলিশ মোতায়েন ছিল কাছেই। নইলে কী যে হতো!

পশ্চিমবঙ্গের অরাজক ও অসভ্য অবস্থা দেখে এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন "একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন সেইদিকেই সকলের সব শক্তি নিয়োজিত হবে। খুনোখুনি দু'দিনেই থেমে যাবে।"

অর্থাৎ মহামারী বাধিয়ে দিলে দৈনন্দিন নরহত্যা নিবারিত হবে। চমৎকার দাওয়াই। একেই বলে রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ।

না, এর উপযুক্ত দাওয়াই আমার জানা চাই। শেখ মুজিবকে বধ করতে উদ্যত হলে কী করা উচিত সে-বিষয়ে আমার ধারণা অতি স্পষ্ট। কিন্তু একজন নিরীহ পথচারীকে অতর্কিতে আক্রমণ করলে কী করা উচিত তা আমার ধারণাতীত। আমার এত সাহস নেই যে আমিই বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এসব ক্ষেত্রে আর দশজনের মতো আমারও ধারণা এটা সরকারেরই ডিউটি। তাঁরা আমার কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে পুলিশ পুষছেন। আমাকেই যদি লোকের প্রাণরক্ষার দায় কাঁধে নিতে হলো তবে পুলিশ কেন? ট্যাক্স কেন? সরকারই বা কেন?

তাছাড়া আমি এগিয়ে যাব যে, আমার হাতে হাতিয়ার কোথায়? শুধু হাতে কি চার পাঁচজন সশস্ত্র পুরুষের সঙ্গে লড়া যায়? অস্ত্রশস্ত্র যাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নাকি বলা হয়েছে সরকারের কাছে জমা দিতে। নয়তো বিপ্লবীরা কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু সরকারের কাছে নিজেদের বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল যাঁরা জমা দিয়েছেন তাঁদের আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা হয়েছে? এই তো আমার এক প্রতিবেশীর ঘরে একদল যুবক ঢুকে পিস্তল দাবি করল সেদিন। পিস্তল যে ইতিপূর্বে জমা দেওয়া হয়ে গেছে এ-খবর তারা জানত না। জানলে পিস্তলের জন্যে ভদ্রলোকের ঘর তল্লাসী করত না। অবশেষে তাঁকে গুলী করত না।

এমনি কত ট্র্যাজেডি যে কত জায়গায় ঘটে যাচ্ছে তার জন্যে আমরা কে কতটুকু করতে পারি? তেমনি বিপ্লবীদের উপরে গুলী চলছে। কেন, কী অবস্থায় তার কতটুকুই বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করে জানতে পারি? সরকারী বিবরণ যথার্থ কি অযথার্থ তা যাচাই করার সাধ্য কি আমাদের কারো আছে? তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এসব ঘটনা তো অন্তর্দলীয়। যে বেশি মার খায় সে পুলিশকে দোষ দেয়। পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়। অথচ পুলিশ যদি সক্রিয় হতো, যদি গুলি চালাত, তাহলে পুলিশকেই দোষ দেওয়া হতো আবার অত্যাচারী বলে। পুলিশকে খুন করা হতোও। পুলিশ তো হামেশাই মরছে।

এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরা শত ইচ্ছা থাকলেও মুখ খুলতে পারেন না। খুললেই যার গায়ে লাগে সেই গালাগালি দেয়। সভা করেও দেখেছি বুদ্ধিজীবী-দের কারও সঙ্গে কারো মত মেলে না। অন্ধ কী করে অন্ধকে পথ দেখাবে!

বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আলোক পাবার আগেই লোকে যে-যার পথ বেছে নিয়েছে। লোকে আজকাল সন্ধ্যের পরে বাড়ী থেকে বড়ো একটা বেরতে চায় না। এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত কল দিলে আসেন না। যে সব এলাকায় উপদ্রব বেশী সেসব অঞ্চল থেকে অধিবাসীরা অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। গ্রামে অরাজকতা। গ্রাম থেকে বহুলোক শহরে শরণার্থী হচ্ছেন। সরকারকেই এর সমাধান সন্ধান করতে হবে। তবে জনসাধারণ যদি উদাসীন হন সরকার একা কী করে পুলিশ বা মিলিটারির সাহায্যে সবাইকে রক্ষা করবেন? পুলিশ বা মিলিটারির উপর অতখানি নির্ভর করলে রাষ্ট্র যে পুলিশ রাষ্ট্রেই পরিণত হবে। কিংবা মিলিটারি রাজ চেপে বসবে।

বুদ্ধিজীবীদের দিকে না তাকিয়ে জনসাধারণ যদি নিজের দিকে তাকায় তা হলে দেখবে যে জনমতই সবচেয়ে প্রবল শক্তি। জনমত প্রবল বলেই মানুষ মানুষের মাংস খায় না। মানুষ রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে বেড়ায় না। এসব বন্ধ করার জন্য কেউ সরকারের দ্বারস্থ হয় কি? বুদ্ধিজীবীদের উপর বরাত দেয় কি? জনসাধারণ পণ করলে দৈনন্দিন নরহত্যাও বন্ধ করতে পারে। দাদারা না বলেন তো নাই বললেন। সাধারণ লোকেরও তো মুখ আছে। তারা যদি একবার মুখ খোলে তা হলেই যথেষ্ট কাজ হয়।

জবাহরলাল ও সেকুলার রাষ্ট্র

ইংরেজিতে সেকুলার কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। সেইজন্যে এর একটিমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমরা কখনো বলি ধর্মনির্বিশেষ, কখনো ধর্মনিরপেক্ষ, কখনো ধর্মে নিরপেক্ষ। প্রত্যেকবারই ধর্মকে টেনে এনে সামনে বসিয়ে দিই।

মানুষের ইতিহাসে রাষ্ট্রের চেয়ে ধর্মের গুরুত্বই ছিল বেশি। ধর্ম চেয়েছিল জীবনের সমস্ত বিভাগকে প্রভাবিত করতে, অনুরঞ্জিত করতে। রাষ্ট্রও তো জীবনের একটি বিভাগ। রাজনীতিও তাই। ধর্ম চেয়েছিল রাষ্ট্রকে তথা রাজনীতিকেও প্রভাবিত করতে, অনুরঞ্জিত করতে। সব ধর্মের ওই একই দাবী। সব রাষ্ট্রের উপরেই দাবি খাটানোর চেষ্টা। সব দেশের ইতিহাসেই এর বিচিত্র বিবরণ।

যে দেশে একটাই ধর্ম সে দেশেও ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের, চার্চের সঙ্গে রাজার বিরোধ বেধেছে। ক্যাথিড্রালের মধ্যেই আর্চবিশপ বেকেট খুন হয়েছেন রাজার আদেশে। কিন্তু এ বিরোধ চরমে ওঠে যখন ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে লুথারপন্থী ও ক্যালভিনপন্থীরা পৃথক হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র চার্চ প্রবর্তন করেন। সেই সুযোগে রাজারাও বিভিন্ন দলে ভিড়ে যান ও তাঁদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেন। অনেক মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনির পর দেখা গেল ধর্মের চেয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি, গুরুত্ব বেশি। পোপের প্রতিনিধিদের চেয়ে রাজাদের ক্ষমতা বেশি, গুরুত্ব বেশি। পরে আবার আরেক দফা হানাহানি, বিদ্রোহ, বিপ্লব। এবার দেখা গেল রাজার চেয়ে পার্লামেন্টের দাপট বেশি। কংগ্রেসের দাপট বেশি। আমেরিকা স্বাধীন হয়ে গেল। ফ্রান্স বিপ্লব বাধিয়ে দিল। ইংলণ্ডই নাটের গুরু। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধেই স্থির হয়ে যায় যে রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার বলে কিছু নেই। যেমন নেই পোপের ঐশ্বরিক অধিকার।

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইউরোপের নানা দেশে যে চিন্তা বিবর্তিত হয় তারই প্রতিফলন দেখা গেল আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র তথা বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের নব রাষ্ট্রে। আমেরিকানরা বলে যার যার ধর্ম তার তার নিজের ঘরে বা চার্চে বা সিনাগগে বা মন্দিরে বা মসজিদে। রাষ্ট্র তার দরবারে ধর্মের

নামে বাছবিচার করবে না কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্টান্ট, কে ইহুদি বা হিন্দু বা মুসলমান। নির্বাচনে বা নিযুক্তিতে ধর্মভেদ নেই। রাষ্ট্রপরিচালিত বিদ্যালয়েও না। বিশ্ববিদ্যালয়েও না।

আমেরিকার নেতারা মনে প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, তাই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীকে আমল দেন নি। বিপ্লবী ফ্রান্সের নায়করা অনেকেই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী বা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী বা বস্তুবাদী। ঈশ্বরকে বাদ দিতেই তাঁদের আগ্রহ, তাই তাঁদের রাষ্ট্রের যথেষ্ট স্থান ছেড়ে দেওয়া হয় ধর্মহীন ও চার্চহীন ব্যক্তিদের।

আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্র যে অর্থে সেকুলার ফ্রান্সের বিপ্লবী রাষ্ট্র সেই অর্থে সেকুলার নয়। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজমের মার্কসবাদী রূপ যখন প্রভাব বিস্তার করে ও বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েট বিপ্লব ঘটায় তখন লেনিন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র আরো এক অর্থে সেকুলার হয়। সেখানে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বা ধর্মবিশ্বাসীরা বুর্জোয়াদের লোক বলে বা প্রতিবিপ্লবীদের চর বলে সন্দেহ-ভাজন হয়। রাষ্ট্রের বা পার্টির সংগঠনে আফিংখোরদের ঠাঁই নেই। ধর্মই জনগণের আফিং।

এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আসা যাক। রাষ্ট্রের উপর ধর্মের প্রভাব হিন্দু রাজত্বেও পড়েছে, মুসলমান রাজত্বেও পড়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে পড়ে নি। ব্রিটিশ রাজত্বকে কেউ খ্রীস্টান রাজত্ব বলেও না। গোড়া থেকেই ইংরেজরা জানিয়ে রাখে যে তারা ধর্মব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। খ্রীস্টান বলে যে কোনো প্রজা বিশেষ অধিকার বা সুযোগ লাভ করবে তা নয়। খ্রীস্টান নয় বলে যে কোনো প্রজা অধিকারবঞ্চিত বা সুযোগবঞ্চিত হবে তাও নয়। তা বলে কি ব্রিটিশ রাষ্ট্র ছিল সেকুলার? না, সে রাষ্ট্রের একটি রাজকীয় বিভাগ ছিল। চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজকরা সরকার থেকে বেতন পেতেন। হিন্দুর দেওয়া ট্যাক্সে, মুসলমানের দেওয়া ট্যাক্সে লর্ড বিশপ ও অন্যান্য বিশপরাও প্রতিপালিত হতেন। এটুকু বাদ দিলে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ছিল মোটামুটি সেকুলার। সরকারী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল কয়েকটি বাদে সেকুলার। সেই কয়েকটির মধ্যে হিন্দুদের ও মুসলমানদের শিক্ষায়তনও ছিল। তেমনি আইন আদালতও ছিল মোটের উপর সেকুলার। হিন্দু আইন মুসলমান আইন ছাড়াও সিভিল কোড ছিল। ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড ছিল, পীনাল কোড ছিল। রাজস্ব প্রভৃতির কানুন ছিল।

ইংরেজ সরকারের প্রতিপক্ষ হিসাবে ইণ্ডিয়ান ন্তাশনাল কংগ্রেস গড়ে ওঠে। তার সদস্যদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন, খ্রীস্টানও ছিলেন, পার্শীও ছিলেন। আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁরা অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক। ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে প্রশ্ন করা হত না। যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল ধর্ম নয়, জাতীয়তাবোধ। সেক্ষেত্রেও কংগ্রেস গোঁড়ামি দেখায় নি। ভারতবন্ধু ইংরেজদেরও সম্মানের আসন দেয়। কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডব্লিউ সি বনার্জি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। লোকের ধারণা খ্রীস্টান। এই ভ্রান্তির কারণ তাঁর স্ত্রী বিলেতে বাস করতে গিয়ে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের নামকরণে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয় দেখে ভুল হতে পারত যে তাঁরা খ্রীস্টান। তা নয়, তাঁরা ছিলেন হিন্দু। তবে তাঁদের শেষের দুটি বোন খ্রীস্টান।

কংগ্রেসের ঐতিহ্য তৈরী করে যান বনার্জি, নওরোজী, তৈয়বজী প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদী, পার্শী ও মুসলমান। তাঁদের জীবদ্দশায় ইংরেজ যদি চলে যেত ও কংগ্রেস যদি উত্তরাধিকারী হতো তা হলে দেখা যেত স্বাধীন ভারতও ব্রিটিশ রাষ্ট্রের মতো মোটের উপর সেকুলার। পুরোপুরি না বলে মোটের উপর বলছি এইজন্যেই যে ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা নয়। এর ইতিহাস অন্যরূপ। ইউরোপ আমেরিকায় যা বিবর্তিত হয়েছে এখানে তা বিবর্তিত হয় নি, প্রবর্তিত হয়েছে। সেইজন্যে প্রবর্তকরা চলে গেলে তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই বিবাদ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সে সম্ভাবনা যে কতদূর সত্যিকার সেটা ইংরেজ থাকতে আমাদের প্রত্যয় হয় নি। ওদের অপসরণের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। পাকিস্তান হলো প্রকাশ্যভাবে মুসলিম রাষ্ট্র। ভারতও কি প্রকাশ্যভাবে হিন্দুরাষ্ট্র হতে পারত না? পারত বই কি, অনেকে তার জন্যে চাপও দিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত জবাহরলাল সেটা হতে দেন না।

গান্ধীজীর মতো ধার্মিক ব্যক্তি যে সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষপাতী হবেন এটা একটা বিস্ময়। কিন্তু দেশ যখন অখণ্ড ছিল তখনি তিনি বলতে শুরু করেছিলেন যে ভারতরাষ্ট্র হবে সেকুলার রাষ্ট্র। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিপক্ষরা 'রামরাজ্য' বা 'ভগবানের রাজ্যে'র অপব্যাখ্যা করেছিলেন 'হিন্দুরাজ্য' বলে। মহাত্মার দৃষ্টিতে কেবল ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের জনগণ এক ও অবিভাজ্য। কেমন করে তিনি হিন্দুরাজ্য কামনা

করবেন ? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রভৃতির মতো তিনিও চেয়েছিলেন যে ধর্মের জন্যে কেউ কোনো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না, কেউ কোনো অন্যায় সুযোগ লাভ করবে না। মেজরিটি মাইনরিটি সবাই সমান অধিকারী, সমান সুযোগভোগী।

গান্ধীজীকে যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তুলনা করি তো জবাহরলালকে করব ফরাসী বিপ্লবের অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিক নায়কদের সঙ্গে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, তিনি চান ভারতের মুক্তি তথা জনগণের মুক্তি। ঈশ্বরবিশ্বাসী না হলেও তিনি ছিলেন মানববিশ্বাসী, মানবিকবাদী। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে ও প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসতেন, তার কাছে শিক্ষা নিতেন। বিজ্ঞানের ছাত্রহিসাবে তাঁর ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়ন করে তিনি সেখানকার যুক্তিবাদী ইণ্টেলেকচুয়ালদের মন মেজাজ পান। ভারতের মাটির গুণে তিনি সনাতন ধর্মবিশ্বাসের উপর বিরূপ হতে পারেন নি, তাই তাঁকে ঠিক ফরাসী বিপ্লবীদের অনুবর্তী বলা যায় না। রুশবিপ্লবীদের মতো তিনি ধর্মবিশ্বাসমাত্রেরই উপর বিরূপ তো নয়ই।

জীবনের বিচিত্র বিভাগের উপর ধর্মের কর্তৃত্ব মেনে চলা যেমন ধর্মরাষ্ট্রের লক্ষণ তেমনি সেকুলার রাষ্ট্রের লক্ষণ হলো যুক্তির কর্তৃত্ব মেনে চলা। জবাহরলাল যেখানে যা অযৌক্তিক দেখেছেন তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেছেন। অনেকের মতে ভারত যখন সেকুলার রাষ্ট্র তখন হিন্দু আইনে হস্তক্ষেপ করে কেন, তার সংস্কার করে কেন ? তাই যদি করল তবে সব সম্প্রদায়ের উপর ঢালা সিভিল আইন জাহির করে না কেন ? মনে রাখা দরকার যে জবাহরলাল ডিক্টেটর ছিলেন না। যা কিছু তিনি করেছেন তা পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের ভোট নিয়ে। যা করতে পারলেন না তার স্বপক্ষে ভোট বেশি ছিল না। মুসলিম আইনের সংস্কার করতে হলে বেশির ভাগ মুসলিম ভোট থাকা চাই। আমাদের এই সেকুলার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রথা ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। যেখানে কনষ্টিটিউশন অনুকূল যেখানে কনভেনশন অনুকূল নয়। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই জবাহরলালকে পদে পদে সংযত হতে হয়েছিল।

কিন্তু সংযমের চেয়ে অধীরতাই তাঁর চরিত্রে অধিকমাত্রায় ছিল।

রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী ছিলেন না, সমাজনীতিতেও না। সেইজন্যই তাঁর দ্বারা হাজার হাজার বছরের বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ হতে পারল, বিশেষ কারণ থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত হলো, অসাম্প্রদায়িক বিবাহের বাধা দূর হলো। অনেকেই তাঁকে সবুর করতে বলেছিলেন, বিদ্রোহের ভয় দেখিয়েছিলেন, তিনি দমেন নি। কিন্তু কোথায় দাঁড়ি টানতে হবে জানতেন। তার চেয়ে আরো এক পা এগোতে গেলে বিপদ ডেকে আনতেন। নিজের জন্যে নয়, কারণ বার বার তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। দলের জন্যে, পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার জন্যে। এই ব্যবস্থায় ওই সময়ে ওর চেয়ে গভীরতর পরিবর্তন আনা সম্ভবপর ছিল না! দেশ প্রস্তুত হলে সেসব ক্রমশ হবে।

ত্রিশক্তি

কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনটি প্রধান শক্তি কাজ করছে। একটি তো হলো জাতীয়তাবাদ, যার লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। আর একটি, গণতন্ত্র, যার লক্ষ্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণের রাষ্ট্রশাসন। তৃতীয়টির নাম সামাজিক ন্যায়, নাগরিকে নাগরিকে যাতে অধিকার বৈষম্য বা সুযোগের বৈষম্য বা শ্রেণীগত বৈষম্য না থাকে। থাকলে সেটা যেন চিরস্থায়ী না হয়। সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে সাম্য।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ মোটের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এর জন্যে দেশকে দু'ভাগ করতে হয়েছে। তা না হলে জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ মুসলমানের আন্তরিক সমর্থন পেত না। জোর করে তাদের উপর এক নেশন চাপিয়ে দেওয়া যেত না। এখন আবার দেখছি পাকিস্তানেও সেই একই সমস্যা। পাকিস্তান ভাগ হযে যাচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ চায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। জোর করে বাঙালীর উপর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

গণতন্ত্র যে পাকিস্তানে ব্যর্থ হয়েছে তা তো সুস্পষ্ট। কোনোদিন যে ওখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে তার সম্ভাবনা সুদূর। মিলিটারি শাসন সিভিলের মুখোশ পরলেও তার কলকাঠি নাড়বে রাওয়ালপিণ্ডির আর্মি হেডকোয়ার্টার্স। গণতন্ত্রে কখনো বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো এত বৃহৎ সৈন্যদল রাখতে নেই। সৈন্যদলই পাকিস্তানের মেরুদণ্ড। সে রাষ্ট্রে জনশক্তির প্রতিফলন পড়বে কী করে! পার্লামেণ্ট শক্তিশালী হবে কী করে? সৌভাগ্যের বিষয় ভারত এবিষয়ে সাবধান। এ রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি থাকে তবে সে আর্মি নয়, সুপ্রীম কোর্ট। তা হলে কি এদেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত? বলা কঠিন, কারণ একটিমাত্র দলই রাষ্ট্রশাসন চালিয়ে আসছে গত চব্বিশ বছর ধরে। এই দলটি হেরে গেলে যে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হবে তা পূর্ণ করবে কে? কোথায় সেই অপোজিশন পার্টি যে শূন্য গদীতে বসে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান হয়ে

রাষ্ট্রশাসন চালাবে? বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি একাকার করে একপ্রকার পাঁচমিশেলী সরকার গঠন করলে কী হয় পশ্চিমবঙ্গই তার দৃষ্টান্ত। বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো বারো বছরে তেরো নির্বাচনই কি গণতন্ত্রের নমুনা?

সামাজিক ন্যায় যে আমাদের দেশেও অভীষ্ট একথা সকলেই মানেন। এমন কি দক্ষিণপন্থী দলগুলিও। তবে কতকগুলি প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। প্রথমত, সামাজিক ন্যায় কি জাতীয়তাবাদকে লঙ্ঘন করে হবে,না তাকে স্বীকার করে হবে? অনেকের মতে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এককালে তো শোনা যেত রাশিয়ার যুদ্ধই আমাদের যুদ্ধ বা জনযুদ্ধ। নেশনকে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থান না দিলে ন্যাশনালিস্ট হওয়া যায় না। আগে ন্যাশনালিস্ট হতে হয়, তারপরে কমিউনিস্ট হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এখনো বলতে পারা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে যদি ভারত কারো সঙ্গে যুদ্ধে নামে কমিউনিস্টরা কোন শিবিরে যোগ দেবেন।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ন্যায় কি গণতান্ত্রিক সংবিধানের মাধ্যমে হবে, না সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে? এ প্রশ্নের উত্তরে নকশালপন্থীরা বলেন, সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে। অন্যান্য কমিউনিস্ট দল পার্লামেন্টেও যান, বন্‌ধও ডাকেন, জমি দখলও করেন, আদালতেরও আশ্রয় নেন। তাঁরা যদি জেতেন পার্লামেন্ট রাখবেন কি না কেউ বলতে পারে না। হয়তো সংবিধানটাই বাতিল করবেন।

তৃতীয়ত, সামাজিক ন্যায়ের জন্যে যদি সংগ্রামে নামতে হয় তবে জনগণ কি অহিংস অস্ত্র ব্যবহার করবে, না সহিংস অস্ত্র? এই প্রশ্নের উত্তরে নকশালদের মত সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। তাঁরা পরিপূর্ণরূপে হিংসাবাদী। অন্যান্য কমিউনিস্ট দলগুলি উপায়হিসাবে অহিংসাকেও কাজে লাগাতে রাজী। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁরা সত্যাগ্রহ করেছিলেন। সেটা গান্ধীজীর অস্ত্র। তবে অহিংসার চেয়ে হিংসার উপযোগিতাই কমিউনিস্টদের অধিকাংশের বিচারে বেশী। এর কারণ রাশিয়াতে চীনে কিউবাতে ও ভিয়েৎনামে হিংসারই জয়জয়কার।

তা ছাড়া আরো একটি প্রশ্ন আছে, সেটি হলো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন। ভারত সরকার যদি ইচ্ছা করেন তবে কলকারখানা ব্যাঙ্ক ইনশিওরান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু সংবিধান অনুসারে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে তাঁরা বাধ্য।

উপযুক্ততার নিরিখ তাঁরা সুপ্রীম কোর্টের উপরে ছেড়ে না দিয়ে পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু উপযুক্ত কখনো শূন্যের কোঠায় পড়তে পারে না। কাউকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেব না, এ নীতি একবার গ্রহণ করলেই দেশময় এমন অনর্থ বাধবে যে সরকারকেই পিছু হটতে হবে। যারা প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ্বাস করে বা যাদের প্রাইভেট প্রপার্টি আছে তারা সংখ্যাধিক না হতে পারে, কিন্তু তারা সর্বঘটে। আর-সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করলেও ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা বিনা রক্তপাতে হবে না। অত টাকাও নেই যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারা যাবে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে ভারতের মতো দেশে ধর্মের প্রভাব এখনো অত্যন্ত বলবান। ধর্মের সঙ্গে বলপরীক্ষা না করে সমাজবিপ্লব করতে গেলে মাঝখান থেকে ক্ষমতা দখল করবে মিলিটারী বা ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ। যাঁরা সমাজবিপ্লব চান তাঁরা যেন মিলিটারি বা ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপের সঙ্গে বলপরীক্ষার জন্যেও প্রস্তুত থাকেন। আর নয়তো তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে এমন এক জাতীয় দুর্যোগের জন্যে যখন শাসনব্যবস্থা আপনি ভেঙে পড়ছে, লোকে খেতে পাচ্ছে না, সৈন্যদল চারদিক থেকে মার খেতে খেতে হটে আসছে, পুলিশ পলাতক, জনতা অরাজক, অর্থনৈতিক জীবন পক্ষাহত। এমনটি অন্যত্র ঘটেছে, এখানেও ঘটতে পারে কিন্তু ঘটবেই এমন কোনো অবশ্যম্ভাবিতা নেই। সব দেশে তো ঘটেনি। স্বার্থত্যাগ দিয়ে, সুব্যবস্থা দিয়ে, দূরদর্শিতা দিয়ে, যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে চলার সংকল্প দিয়ে জাতীয় দুর্যোগ পরিহার করা সম্ভব। আমরা কেন ধরে নেব যে ভারতের নেতারা ক্রমাগত ভুলই করবেন, আর ভারতের জনমত তাঁদের প্রত্যেকটি ভুল সুবোধ বালকের মতো মাথা পেতে মেনে নেবে! জনমত যেখানে সক্রিয় সেখানে ভ্রান্ত নেতাদের পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত করাও সম্ভব। এ পাট কি রাশিয়ায় বা চীনে ছিল?

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী

হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের লোক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসবান। তারা ভাবতেই পারত না যে বিদেশের একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী চিরকাল এ দেশ শাসন করবে। পলাশীর পর যে পটপরিবর্তন হয় সেটা ছিল তাদের মতে সাময়িক একটা চন্দ্রগ্রহণ কি সূর্যগ্রহণ। পরে যাঁর সিংহাসন তিনি ফিরে পাবেন। আবার মুঘল বাদশাহ। আবার মরাঠা পেশোয়া।

সিপাহীবিদ্রোহের পেছনে ছিল এই বিশ্বাস যে ইংরেজশাসনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে, তাই তার আয়ু ফুরিয়েছে। এখন থেকে আবার মুঘল শাসন, মরাঠা শাসন। বিপ্লবের পেছনে যেমন ঐতিহাসিক অনিবার্যতা থাকে বিদ্রোহের পেছনেও তেমনি। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ইংরেজরা তাদের রাণীকেই ভারতের মহারাণী করে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এ দেশের লোক রাজতন্ত্র ফিরে পেয়ে মহারাণীর অনুগত প্রজা হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। তারা অত সহজে ভোলে না। রাজতন্ত্র ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু শাসনটা তো বিদেশী শাসন। মুঘলরা এ দেশের স্বার্থেই এ দেশ শাসন করত, বিদেশীদের স্বার্থে নয়। এ দেশের ধন এ দেশেই রাখত, বিদেশে চালান দিত না। মহারাণীর রাজত্বে কি এ দেশের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না বিদেশের? তাই শিক্ষিত সমাজের দাবী হলো ভারতের শাসন ভারতের স্বার্থেই পরিচালিত হবে, বিলেতের স্বার্থে নয়। এটা একটা মৌল পরিবর্তন। এটা যদি ঘটে তবে মাথার উপরে মহারাণী থাকতে পারেন। রাজতন্ত্রে তাঁদের আপত্তি নেই। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে মাথার উপরে একজন রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি না থাকলে দেশ অরাজক হবে। রিপবালিক এ দেশে চলবে না। প্রেসিডেন্টকে কেউ মানবে না। মুঘল বাদশাহের প্রত্যাবর্তন যখন আর সম্ভব নয় তখন ভারতীয়দের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি সর্বসম্মতিক্রমে সম্রাট হবেন?

মাথার উপরে মহারাণীই থাকুন কিন্তু আসল ক্ষমতাটা ছেড়ে দিন ভারতের [illegible]চিত প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের হাতে। বিলেতের মতো এ দেশেও [illegible]ব পার্লামেন্ট। এ দেশের সরকার সেই পার্লামেন্টের কাছেই দায়ী

থাকবেন। দেশের শাসন দেশের স্বার্থেই পরিচালিত হবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা এই ধরণের স্বাধীনতাই কামনা করেছিলেন। এর বেশী করতে সাহস পাননি। কারণ বরাবরই তাঁদের ভয় ছিল যে প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সিভিলে মিলিটারীতে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি বেধে যাবে। গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবে দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। যেমন ইংরেজ শাসনের পূর্বে ছিল তেমনি পরেও হবে, যদি সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধি না থাকেন।

এ আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের মনেও ছিল। শেষ বয়সেও তাঁকে বলতে শোনা গেছে যে দেশের লোক আগে ঐক্যবদ্ধ হোক, তার পর ইংরেজরা যাবে।

নইলে অরাজকতা অনিবার্য। এ আশঙ্কা গান্ধীজীর মনেও ছিল। শেষ বয়সে তিনি উপলব্ধি করেন যে অরাজকতার ঝুঁকি নিয়েও স্বাধীন হওয়াই শ্রেয়। নয়তো ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। যেমন করে সঁপে দিয়েছে বর্মীদের। তাই তিনি আওয়াজ তোলেন, ভারত ছেড়ে চলে যাও, দিয়ে যাও ভগবানের হাতে বা অরাজকতার হাতে। তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজরা শেষ মুহূর্তে একটা ন্যাশনাল গর্ভর্নমেণ্ট তৈরি করে দিয়ে তার হাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর করে যাবে। অরাজকর্তার ঝুঁকি তারাও কি নিতে চাইবে?

তিনি বোধ হয় জানতেন না কিংবা জানলেও মানতেন না যে মুসলিম লীগ ততদিনে ১৯৩৭ সালের তুলনায় বহুগুণ সংঘবদ্ধ, বহুগুণ প্রবল ও বহুগুণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাকে যদি ক্ষমতার অংশ না দেওয়া হয় তবে ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট সে গড়ে তুলতে দেবে না, তাকে বাদ দিয়ে গড়ে তুললে সে বিদ্রোহ করবে, তাকে নিয়ে গড়ে তুললেও সে বানচাল করে দেবে। ইতিমধ্যে সে এক-নেশন তত্ত্বে বিশ্বাস হারিয়েছে, কারণ সে উপলব্ধি করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস মেজরিটি অপ্রতিরোধ্য, যেহেতু কেন্দ্রীয় বিধান সভায় কংগ্রেস মেজরিটি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট বলতে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টই বোঝাবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে বোঝাবে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের হাতেই ক্ষমতার হস্তান্তর। মুসলিম লীগ তা কিছুতেই হতে দেবে না। মুসলিম জনতাকে তো উত্তেজিত করবেই, মুসলিম সৈন্যদেরও বিক্ষুব্ধ করে তুলে যুদ্ধের মাঝখানে বিশৃঙ্খলা বাধাবে।

মুসলিম লীগের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী উস্‌কানীও ছিল। কিন্তু তার চে

অনেক বেশী ছিল পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা। ইংরেজদের প্রস্থান যদি আসন্ন হয়ে থাকে তবে মুঘল বাদশাহই তো তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারী। যেটা সিপাহী বিদ্রোহের সময় সবাই ধরে নিয়েছিল সেটা লীগপন্থী মুসলমানরা মনে মনে পুষে রেখেছিল। ইংরেজ যাচ্ছে তো যাক, কিন্তু যার সিংহাসন তাকেই দিয়ে যাক, হিন্দুকে কেন? এখন অবশ্য তামাম হিন্দুস্থান পেলেও সামলাতে পারা যাবে না। তাই এখানকার দাবী পাকিস্থান। কায়দে আজম গান্ধীজীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আওয়াজ তোলেন, ভারত ছেড়ে যাও, যাবার আগে ভাগ করে দিয়ে যাও। কংগ্রেসের ও লীগের মধ্যে। তার মানে 'দু'দুটো ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট। একটা হিন্দু নেশনের, অপরটা মুসলিম নেশনের। এ উক্তি ইংরেজের শেখানো নয়, তবে এতে ইংরেজেরই অপসরণ বিলম্বিত হয়। যুদ্ধের মাঝখানে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের হাই কমাণ্ড দিল্লীর নয়, লণ্ডনের নির্দেশে চলছিল। হস্তান্তর হলে তাতে ছেদ পড়ত।

যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল তখন ক্ষমতার হস্তান্তরে ইংরেজদের দিক থেকে আর কোন বাধা রইল না। বাধা এল মুসলিম লীগের দিক থেকে। ততদিনে মুসলিম লীগের শক্তি আরো বেশী বেড়ে গেছে। তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন। এক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া আর সব জায়গায় মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। পাঞ্জাব ছিল ইউনিয়নিস্টদের ঘাঁটি। সেখানে দু' একজন বাদে সবাই পরাস্ত। মুসলিম লীগের কথা হলো ব্রিটেন যদি কেবল মেজরিটির হাতে ক্ষমতা তুলে দেয় তবে মাইনরিটিকেও মেজরিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। গণতন্ত্র মানেই মেজরিটি রুল। আর মেজরিটি রুল মানেই তো হিন্দুরাজ। হিন্দুরাজ যদি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরাজই বা হবে না কেন? মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে জুড়ে জুড়ে আলাদা একটা রাষ্ট্র বানালে তো মাইনরিটির জন্যে আর কোন সেফগার্ডের দরকার হয় না।

মুসলিম লীগের এই যে বক্তব্য এটা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন মুসলিম নেতার বক্তব্য। হিন্দুরাই যদি ইংরেজদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয় মুসলমানরা তবে দাঁড়াবে কোথায়? তারা কি হিন্দুর দাস হবে? যতবার শাসনসংস্কারের প্রশ্ন উঠেছে প্রত্যেকবারেই তাদের জন্যে একটা সেফগার্ড রাখবার প্রস্তাবও উঠেছে। মাইনরিটির জন্যে সেফগার্ড গণতন্ত্রের একটা মৌল অধিকার। শিখরাও একটা দাবি করেছিল ও পেয়েছিল। শিখপ্রধান প্রদেশ

থাকলে শিখরাও শিখিস্থানের প্রস্তাব তুলত। গোটা পাঞ্জাবটার উপরেই ওদের ঐতিহাসিক দাবী ছিল। কিন্তু এত ছোট একটি মাইনরিটি কী করে এত বড়ো একটা প্রদেশ গণতন্ত্রের বিধান মেনে চালাবে?

ইউনিয়নিস্ট, শিখ ও কংগ্রেস মিলে পাঞ্জাবে যে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে সেটা ধোপে টেঁকে না। তখন দেখা গেল মুসলিম লীগেরও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই স্বয়ং গভর্নর নিলেন শাসনভার। তিনি তো চিরদিন মন্ত্রীবিহীন থাকতে পারেন না। তাই রব ওঠে, পাঞ্জাবকে ভেঙে দু'ভাগ করো। এদিকে বাংলাদেশে লীগ সরকার গঠন করা হয়েছিল। কেবলমাত্র মুসলিম ভোটে নির্বাচিত একদল লোক চিরদিন হিন্দুদের উপর শাসন চালাবে, হিন্দুরা যেখানে শতকরা ৪৬ জন। প্রতিধ্বনি ওঠে, বাংলাদেশকেও কেটে দু'ভাগ করো। এতে মুসলিম লীগের ভারত ভাগের দাবী নৈতিক সমর্থন পায়। লীগ অবশ্য বাংলাদেশ ভাগে রাজী ছিল না। পাঞ্জাব ভাগেও না। কিন্তু হিন্দু ও শিখ মাইনারিটিকে আর কী সেফগার্ড দেওয়া যায়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

॥ ২ ॥

কেবলমাত্র মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলী থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সরকার সারা বাংলা শাসন করবে এটা যেমন বাংলাদেশের হিন্দুদের মতে অন্যায়, তেমনি কার্যত কেবলমাত্র হিন্দু নির্বাচক মণ্ডলী থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সরকার সারা ভারতবর্ষ শাসন করবে এটাও ছিল ভারতবর্ষের মুসলমানদের মতে অন্যায়। ইংরেজ বড়লাট ও লাটসাহেবরা ছিলেন বলে তবু তাঁদের ভরসায় লোকে সহ্য করছিল, কিন্তু তাঁরা যখন থাকতেন না তখন সহ্য হতো কী করে? মাথার উপরে ইংরেজ সম্রাট না থাকলে তো আরো এক বিপদ। সৈন্যরা ও সিভিল কর্মচারীরা কার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিত?

সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথই হিন্দু মুসলমান শিখ সৈন্যদের একতাবদ্ধ করেছিল। তেমনি সিভিল কর্মচারীদের। প্রেসিডেন্টের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন উঠলেই মুসলিম সৈন্য ও সিভিল কর্মচারীদের দিক থেকে আপত্তি উঠত, যদি তিনি হতেন কংগ্রেসের মনোনীত। তেমনি গভর্নরের প্রতি আনুগত্যের

প্রশ্ন উঠলেই হিন্দু ও শিখদের দিক থেকে আপত্তি উঠত, যদি তিনি হতেন মুসলিম লীগের মনোনীত। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে বড়লাট যে ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট গঠন করেছিলেন তার সদস্য হিসাবে জবাহরলাল ও বল্লভভাই অনুভব করলেন যে মুসলিম সৈন্য ও সিভিল কর্মচারীদের আনুগত্য তাঁদের প্রতি নয়, মুসলিম সদস্যদের প্রতি। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ফাটল ধরে যায়। ইংরেজ থাকতেই। ইংরেজ চলে গেলে তো সরকার আপনা থেকেই দু'চির হয়ে যাবে। হিন্দুর হুকুম মুসলমান মানবে না, মুসলমানের হুকুম হিন্দু মানবে না।

ভারতকে অখণ্ড রাখার একমাত্র উপায় ছিল কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। তেমনি বাংলাকে ও পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখায় একমাত্র উপায় ছিল কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে সেটা বাস্তব, তা হলেও প্রশ্ন ওঠে, সেটা কি একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারত? এমন কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল কি যেটা সেই দরকারী বন্দোবস্তটাকে চিরস্থায়ী করতে পারত? না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইলে পার্টিশন চাইতে হতো। অথবা বলকানীকরণ। অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা, অবিভক্ত পাঞ্জাবের স্বাধীনতা। সেক্ষেত্রেও তো কংগ্রেসের প্রতি লীগের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন উঠত, কোয়ালিশনের প্রয়োজন থাকত, সেটাকে চিরস্থায়ী করার জন্যে সংবিধানের উপর বরাত দিতে হতো। তেমন কোনো সংবিধানের সম্ভাবনা ছিল কি?

লীগ প্রদেশভাগে রাজী হলে কংগ্রেস দেশভাগে রাজী হয়। নইলে যেটা ঘটত সেটা ইংরেজের প্রস্থান ও কংগ্রেস লীগের সিভিল ওয়ার বা ওয়ার অফ সাকসেসন।

ন্যাশনালিজম নামক যে শক্তিটি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিল সে একটানা সংগ্রামের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ধরলে চল্লিশ বছর। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে দ্বিতীয় এক সংগ্রামের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয় সংগ্রাম একবার শুরু হলে চার পাঁচ বছরের আগে শেষ হতো না। মুসলিম লীগের পেছনেও জনবল, শস্ত্রবল, শাস্ত্রবল ছিল। আর ছিল বৈদেশিক পৃষ্ঠপোষকতা। উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সংগ্রামের মতো সেও ডেকে আনত বিদেশী হস্তক্ষেপ। সেখানে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরাভব ঘটেছে, তার স্থান নিয়েছে অপর এক

সাম্রাজ্যবাদ। এখানেও সেই রকম কিছু হতো।

সুতরাং জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে আপস করেন সেটা দ্বিতীয় একটা সংগ্রাম নিবারণের জন্যে। দেশের লোক তাঁদের সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। এর পরে নতুন সরকারের বিরোধীপক্ষ বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। যারা থাকে তাদের বল কম। অতি সহজেই সংবিধান তৈরি হয়ে যায়। সে সংবিধান অত্যন্ত প্রগতিশীল সংবিধান। এই পঁচিশ বছরে তার কয়েক দফা সংশোধন হয়েছে। সেটাও অধিকতর অগ্রগতির খাতিরে। এত বড়ো একটি বহুধর্মী ও বহুভাষী দেশকে একসূত্রে গাঁথার জন্যে আমরা মুঘলের মতো বা ইংরেজের মতো বাহুবলের আশ্রয় নিইনি। মাইনরিটির উপরেও মেজরিটির ইচ্ছা চাপিয়ে দিইনি। ধর্মের ব্যাপারে যতদূর উদার হতে হয় হয়েছি। হিন্দুপ্রধান দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করা কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়? মাউন্টব্যাটেন তো আলাপ আলোচনার সময় "হিন্দুস্থান" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে। আমাদের নেতারাই বলেন, "হিন্দুস্থান নয়, ইণ্ডিয়া।" তার মানে এ দেশ কেবল হিন্দুদের নয়, যারা এ দেশের সন্তান তাদের সকলের।

এই যে সেকুলার আইডিয়া এটি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনায় ছিল। কংগ্রেসকে তাঁরা কোনো একটা ধর্মের সঙ্গে এক করে দেখেননি! এমন কি ধর্ম জিনিসটার সঙ্গেই একাকার করেননি। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী হিন্দু। তাঁর স্ত্রী পরে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা নেন। দাদাভাই নওরোজী তো পার্শী। বদরুদ্দীন তৈয়বজী মুসলমান। তখনকার দিনে ইউরোপীয়ানদেরও সভাপতি করা হতো। জেনারেল সেক্রেটারি হিউম ছিলেন ইউরোপীয়ান। বিশ বছরের উপর তিনি উক্ত পদে ছিলেন। কংগ্রেস কেমন করে হিন্দুদের সংগঠন হয়, কংগ্রেসের সংগ্রাম কেমন করে হিন্দুদের সংগ্রাম হয়, কংগ্রেস যে সংবিধানের উদ্যোক্তা সেই বা কেমন করে হিন্দু রাষ্ট্রের বিধাতা নয়? প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের ঐতিহ্য ছিল আমাদের সেকুলার স্টেটের পেছনে।

ন্যাশনালিজম যেমন একটি শক্তি সাম্প্রদায়িকতাও তেমনি আর একটা শক্তি। এটা ন্যাশনালিজমের চেয়েও পুরাতন। যে দেশে বহু সম্প্রদায় সে দেশে সাম্প্রদায়িকতা তো স্বাভাবিক। এটা তা বলে স্বীকার করা যায় না যে দেশ হচ্ছে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের। পাকিস্তান যখন দাবী করা হয়েছিল তখন বলা

হয়েছিল ওটা মুসলমানপ্রধান দেশ হলেও ওখানে আর সব সম্প্রদায়ও থাকবে। কিন্তু পরে শোনা গেল ওটা নাকি খালি মুসলমানদেরই দেশ। ওখানে আর কেউ স্বাগত নয়। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে। মুসলমানকে অভয় দেবার অপরাধে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ গেল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সেইখানেই ক্ষান্ত হলো না। লোকবিনিময়ের উদ্যোগ করল: হিন্দুরাষ্ট্র সংস্থাপনই হয়ে দাঁড়াল তার লক্ষ্য।

এই দুরন্ত শক্তির সঙ্গে বলপরীক্ষা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু করবে যারা তাদের মধ্যেও কিছু কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তবে ভারত তো আর মধ্যযুগে অবস্থিত নয়। পাকিস্তানের মতো মধ্যপ্রাচ্যেও নয়। আধুনিকতা বলে আরো একটি শক্তিও কাজ করছিল। তাই সাম্প্রদায়িকতা অবশেষে কোণঠাসা হয়েছে। ওদিকে পাকিস্তানেও তো বিরাট এক আলোড়ন ঘটে গেল। বাংলাদেশ বলে নতুন এক রাষ্ট্রের উদয় হলো। সে রাষ্ট্র ভারতেরই মতো ধর্মনিরপেক্ষ। প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন আর পুবদিকে তাকায় না। তাকায় পশ্চিম মুখে। পশ্চিম পাকিস্তান এখনো তার ইসলামী গোঁড়ামি ছাড়েনি। যেদিন ছাড়বে সেদিন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর উপজীব্য থাকবে না এপারে বা ওপারে।

এ ছাড়া আরো একটি শক্তি কাজ করে এসেছে। সোশিয়ালিজম বা কমিউনিজম তার নাম। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই। পঞ্চাশ বছর আগে গান্ধীজী যখন নেতৃত্ব নেন তখন গান্ধীবাদের সূচনা হয় ভারতে। তার বছর কয়েকের মধ্যেই মার্কসবাদের প্রবেশ। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ উভয়েরই লক্ষ্য নিপীড়িত শোষিত জনগণের মধ্যে বলসঞ্চার। অহিংস মতে যার নাম গণসত্যাগ্রহ সহিংস মতে তারই নাম বিপ্লব। গান্ধীজী হিংসাকে এড়াতে চেয়েছিলেন বলে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হননি। জনগণের বলসঞ্চয়ের কথাই জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত চিন্তা করেছেন। যেহেতু তিনি অহিংসার পথেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি চেয়েছিলেন সেহেতু তাঁর অর্থনীতিও ছিল বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনীতি। সোশিয়াশিস্ট বা কমিউনিস্টদের অর্থনীতি তার বিপরীত। গান্ধীবাদ কিন্তু কংগ্রেসকর্মীদের সকলের মতবাদ ছিল না, তাঁদের কেউ কেউ মার্কসবাদীও ছিলেন, কেউ কেউ ফেবিয়ান সোশিয়ালিস্ট। গান্ধীজীর প্রয়াণের পর যাঁরা তাঁর অনুসরণ করছেন তাঁদের বর্তমান পরিচয় সর্বোদয়বাদী। সর্বোদয়বাদ গ্রামকেই তার প্রতিষ্ঠা-ভূমি করতে চায়। যেমন সোশিয়ালিজম ও কমিউনিজম করতে চায় শহরকে।

কিন্তু এরা যেমন ডাইরেকট অ্যাকশনে আগুয়ান ওরা তেমনি গণসত্যাগ্রহে পেছপাও।

॥ ৩ ॥

গান্ধীবাদী অর্থনীতিকে কংগ্রেস কোনোদিনই অন্তর থেকে স্বীকার করেনি। সমাজতন্ত্রবাদকেও না। মতবাদের প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরলে কংগ্রেস বহুভাগ হয়ে যেত, তাই গান্ধী বা নেহরু কেউ তার ওপর জোর দেননি, দিয়েছেন ন্যাশনালিজমের উপরে। ইন্দিরা গান্ধী যেই জোর দিতে গেলেন অমনি কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলো। এতদিনে ন্যাশনালিজম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে, গণতন্ত্রও পূর্ণবয়স্ক হয়েছে, তাই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলেও তার ইন্দিরাপন্থী অংশটি আরো শক্তিমান হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মতো সমাজতন্ত্রবাদও এখন কংগ্রেসের মূলনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনা দ্বন্দ্বে এটা হবার নয়। তবে দ্বন্দ্বটা কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব বলেই রক্ষা। দশ বছর আগে হলে শুধু আভ্যন্তরিক হয়ে ক্ষান্ত হতো না। ধনতন্ত্রীরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে বিষম বাধা দিত। কংগ্রেসও ভাঙত, সরকারও ভাঙত।

পাঁচশ বছর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার বিনা বিপ্লবে বিপ্লবের ফললাভ। ভূমিসংস্কার যদি আইনের সাহায্যে ঘটে তা হলে বিপ্লব আবার নিবারিত হবে। একটার পর একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিয়ে বিপ্লবকে বরাবর নিবারণ করাও সম্ভবপর। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের বীজ থেকে যাবে আরো কয়েকটি কারণে। একটি কারণ হচ্ছে জনগণের ধৈর্যচ্যুতি। ভূমিসংস্কার করেও ভূমিহীনদের সবাইকে জমি জোগানো সম্ভব হবে না। বোধহয় বহু কোটিকে। তারা শহরে এসে ভিড় করবে। সেখানেই বা তাদের জন্যে এত চাকরি কোথায়! তা হলে শুধু এটা জাতীয়কৃত করে ওটা বাজেয়াপ্ত করে বেশীদূর এগোনো যাবে না। সমবায়ের উপরে সমষ্টিকরণের উপর ঝোঁক দিতে হবে। সমষ্টিকরণ কি গণতন্ত্রের কাঠামোকে অক্ষত রাখবে? ডিকটেটরশিপ ডেকে আনবে না?

মার্কসবাদ এই পঁচিশ বছরে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। লোকে অহিংসার নাম শুনতে চায় না। গান্ধীবাদী নেতারাও অনশন ও পদযাত্রার চেয়ে জোরালো কিছু জানেন না। সরকার হিংসা দিয়ে হিংসার দমন করছেন, নইলে দেশ অরাজক হবে। মতবাদের সংঘর্ষ মতবাদ দিয়ে জয় করতে হয়,

তেমন মতবাদই বা কোথায় ? তরুণরা ক্রমেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের আচরণ থেকে মনে হয় জোর যার মুলুক তার এইটেই শেষ কথা। একদল যেমন বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আরেক দল তেমনি প্রতিবিপ্লবের জন্যে। ধনীরা স্বেচ্ছায় বিলাসিতা ত্যাগ করে বা ধনভাগ করে মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন না। প্রত্যেকটি আইনের সুযোগ নিচ্ছেন।

এ সমস্ত সত্ত্বেও দেশের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। শিল্পের দিক থেকে ভারত এই পঁচিশ বছরে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। ইংরেজ থাকলে কখনো এতদূর হতো না। কৃষির উপরে নজর ছিল না, নজর পড়েছে। একটু দেরিতে হলেও কৃষির দিক থেকে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চাই কারুশিল্প। বৃহত্তর শিল্পকেও বিকেন্দ্রীকৃত করা চাই। জাপান যেমন করেছে। শহরের দিক থেকে মনটাকে গ্রামের দিকে না ফেরালে বেকারের বন্যা নিরোধ করা যাবে না। সে বন্যা ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাবে। কারণ জন্মনিরোধ যে সেই অনুপাতে ক্ষীণ। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে ভারত সরকার এ বিষয়ে অন্যান্য অনেক সরকারের তুলনায় প্রগতিশীল। ভারতের জনগণকেও সাধুবাদ দিতে হয়। তারাও ব্যাপারটার ন্যায্যতা মানে। শুধু উপযুক্ত উপায় জানে না, জানলেও উপকরণ পায় না।

জাপানের সঙ্গে তুলনায় ভারত এত পেছিয়ে রয়েছে যে এশিয়ার নেতৃত্ব লাভ করা দুরাশা। তা হলেও আমরা গর্ব বোধ করব এইজন্যে যে পশ্চিম ইউরোপের মতোই আমরাও উনিশ বিশটি নেশনে বিভক্ত হতে পারতুম, তার পর জোট বাঁধতে তৎপর হতুম, সেই যে বিবর্তন সেটা আমাদের বেলা নিবারিত হয়েছে। আমাদের সত্যিকার তুলনা চীনের সঙ্গে নয়, জাপানের সঙ্গে নয়, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে পশ্চিম ইউরোপের এক একটি দেশ যেন ভারতের এক একটি প্রদেশ। অনায়াসেই ভারতের এক একটি নেশন হবার ধুয়ো ধরতে পারত। ভবিষ্যতে ধরতে পারে। তার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শক্তিশালী একটি কেন্দ্র আছে বলেই আমরা এটা এড়াতে পেরেছি। তা ছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো শহরেই সব রাজ্যের লোক জড়ো হয়েছে। আর সে রকম শহরের সংখ্যা শিল্পায়নের দরুন বেড়েই চলেছে। রাজ্যে শিল্পায়ন হবে, অথচ রাজ্যের বাইরের লোক আসতে পারবে না, এটা একটা অবাস্তব প্রত্যাশা। ইউরোপের বিকাশশীল দেশগুলিতে এখন নানা

বর্ণের কর্মীর সমারোহ। খোদ ব্রিটেন ভরে যাচ্ছে ভারতীয়তে আর পাকিস্তানীতে। কাজেই কলকাতায় অবাঙালী কাজ পাবে না, বম্বেতে অ-মরাঠা কাজ পাবে না, জামশেদপুরে অবিহারী কাজ পাবে না, এ ধরণের নীতি গ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সঙ্গেই বিরোধ বেধে যাবে। রাজ্যের লোকের স্বার্থের চেযে নেশনের স্বার্থ বড়ো। এই নীতি অনুসারেই ভারতীয় সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে। সেখানে সব রাজ্যের লোক মিলে মিশে কাজ করছে। আমাদের নৌবহর ও বিমান বহরও সর্বভারতীয় উপাদানে গঠিত। বন্দরগুলিও তাই। এক একটি রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাইলে ভারতের সংহতিনাশ হবে। সংহতিনাশ থেকে সর্বনাশ। সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে আরো বেশী জনচলাচলে। সব রাজ্যের লোক সব রাজ্যে যেতে ও কাজ করতে পারবে। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হয়। ভারতও তো একটা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন!

সাম্প্রদায়িকতার মতো ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতাও একটা শক্তি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই সেটা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখে আসছি। ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠন করা হয় ১৯১২ সালে। ভাষাভিত্তিক ওড়িশা ও সিন্ধু গঠন করা হয় ১৯৩৬ সালে। স্বাধীনতার পরে ভাষাভিত্তিক কেরল, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মৈশুর বা কর্ণাটক, মাদ্রাজ বা তামিল নাড়ু, পাঞ্জাবীভাষী পাঞ্জাব, হিন্দীভাষী হরিয়ানা, অসমীয়াভাষী আসাম প্রভৃতি গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে উপজাতিভিত্তিক রাজ্য।

কেন্দ্রের ক্ষমতা যদিও ইংরেজ আমলের তুলনায় কমেনি, বরং বেড়েছে, তবু প্রদেশের ক্ষমতাও প্রভূত। সেই ক্ষমতা দিয়ে ভালো কাজও যেমন বিস্তর হয়েছে মন্দ কাজও তেমনি বিস্তর। প্রত্যেক রাজ্যে সংখ্যালঘুদের মুখে নালিশ। তাদের কেউবা ভিন্নধর্মী, কেউবা ভিন্নভাষী। এক একটি রাজ্য এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সে একটি নেশন বা সাব-নেশন। ভারতে কিন্তু একটাই নেশন আছে, সেটা ভারতীয় নেশন। ভারত একটা মালটিন্যাশনাল স্টেট নয়। সবাই মিলে যদি তাকে মালটিন্যাশনাল স্টেটে পরিণত করে তবে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে। কেন্দ্র দুর্বল হলে দেশরক্ষার ব্যবস্থাও দুর্বল হবে। ভারতের ইতিহাসে কি আমরা দেখিনি কেন্দ্র দুর্বল হলে তার কী পরিণাম?

কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে রাজ্যের জন্যে কী কী ক্ষমতা চাই সেটা ভেবে দেখা দরকার। তামিল নাড়ু অটোনোমির দাবি তুলেছে। অটোনোমি কি

বিচ্ছিন্নতার অভিমুখে নিয়ে যাবে, না কেন্দ্রের সঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র রাখবে? চীনদেশ এ সমস্যার মূলোচ্ছেদ করেছে সারা দেশে একটিমাত্র সরকার রেখে। সেটি কেন্দ্রীয় সরকার। চীনদেশে রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার বলে কিছু নেই। ওদের সকলের এক ভাষা, এক লিপি, এক খাদ্য, এক পরিধান। ওদের মতো ইউনিফর্মিটি আর কোথাও নেই। ভারতের ইতিহাস যে ধারায় চলেনি। ভারতের আদর্শ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমরা ধর্মও রাখব, রাজ্যও রাখব, ভাষাও রাখব, লিপিও রাখব, পরিধানও রাখব, উপরন্তু কেন্দ্রও রাখব, হিন্দীও রাখব, ইংরেজীও রাখব, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কর্ণাটকী সংগীতও রাখব, সংস্কৃতও রাখব।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যও মিলবে। মিশ্র অর্থনীতিও পরীক্ষাধীন। আমরা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ তেমনি গোষ্ঠীনিরপেক্ষ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এর বৈশিষ্ট্যরক্ষাও দেশরক্ষার মতো একান্ত আবশ্যক।

নেশন বলতে কী বোঝায়

ইংরেজরা যদি কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি না টানত তাহলে আফগানিস্তানও ভারত সাম্রাজ্যের অঙ্গ হতো, যেমন হয়েছিল বর্মা। কী জানি কেন, সিংহলকে ওরা ভারত শাসনের বাইরে রেখেছিল, অথচ এডেনকে রেখেছিল ভিতরে। ভুটানের সঙ্গে ওদের বন্দোবস্ত ছিল যে ওদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে ব্রিটিশ ভারত থেকে। সিকিমের সঙ্গে ছিল অন্যরকম বন্দোবস্ত। তার স্বরাষ্ট্রনীতিও নির্ধারিত করত ব্রিটিশ ভারত। নেপালের স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র কোনোটার উপর ব্রিটিশ ভারতের দাবী ছিল না, কিন্তু তার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে নেপাল আক্রান্ত হলে ব্রিটিশ ভারতই হতো তার রক্ষক আর ব্রিটিশ ভারত বা সাম্রাজ্য বিপন্ন হলে নেপাল জোগাত তাকে সৈন্য। চীনের সম্মতি নিয়ে দলাই লামাকে প্রভাবিত করে তিব্বতেও ভারতের ব্রিটিশ শাসন অনুপ্রবেশ করেছিল।

একবার কল্পনা করা যাক যে আফগানিস্তান থেকে বর্মা পর্যন্ত সমস্তটাই ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ও সিংহলও তার সামিল। তাহলে কি বলতে হবে ভারতীয় নেশন বলতে যাদের বোঝায় তাদের মধ্যে পড়ে, আফগান, বর্মী ও সিংহলী? এরা সবাই পরাধীন, সুতরাং স্বাধীনতার পরে এরা সবাই একরাষ্ট্রের শরিক? বলা বাহুল্য, এ যুক্তি আফগানরা স্বীকার করত না, বর্মীরা তো নয়ই, সিংহলীরাও না। অথচ মোগল শাসনেও আফগানিস্তান ভারতের অঙ্গ ছিল: স্বতন্ত্র হয়ে যায় নাদির শাহের আক্রমণের ফলে।

ভারতীয় নেশন বলতে কী বোঝায় ও কী বোঝায় না এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর মতো দেশপ্রেমিকও ধরে নিয়েছিলেন যে বর্মার লোকও ভারতীয় নেশনের একাংশ। বর্মা যদি সময় থাকতে পৃথক না হতো তাহলে ভারতপ্রেমিকদের সঙ্গে বর্মাপ্রেমিকদের সম্পর্কটা হতো পাকিস্থানপ্রেমিকদের সঙ্গে বাংলাদেশপ্রেমিকদের মতো। যেহেতু আমরা সবাই এক নেশন। এর মধ্যে যুক্তির অংশ কতটুকু! সেইজন্যেই দেখা গেল ইংরেজদের বিদায়ের পিঠ পিঠ ভারতীয়দেরও বর্মা থেকে বিতাড়ন। সিংহলেও একই দৃশ্য।

আমাদের একনেশনতত্ত্বের মধ্যে ন্যায়ের ফাঁকি ছিল বলেই দুইনেশনতত্ত্বের উদ্ভব হয়। হিন্দুরাও পরাধীন মুসলমানরাও পরাধীন, অতএব তারা একনেশন এর মধ্যেই বা যুক্তির অংশ কতটুকু? সেইজন্যেই দেখা গেল ব্রিটিশ অপসারণের পিঠ পিঠ পাকিস্থান থেকে হিন্দু শিখ অপসরণ, ইণ্ডিয়া থেকে মুসলিম অপসরণ। এর নাম যদি হিন্দুস্থান হতো তাহলে অপসৃত মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণ হতো। এ রাষ্ট্র যদি হিন্দুরাষ্ট্র হতো তা হলে বহুগুণ। এমন দিন আসত যেদিন হিন্দুস্থানের হিন্দুরাষ্ট্রে একটিও মুসলমান থাকত না। তা হলে হিন্দু মুসলমান এক নেশন হতো না। হতো দুটি নেশন। সঙ্গে সঙ্গে শিখরাও চাইত তৃতীয় এক নেশন হতে। তাদের ধরে রাখা যেত না।

এখন আরো এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আপাতত পাকিস্থানে। আখেরে সর্বত্র। যতগুলি ভাষা ততগুলি নেশন এই যদি সত্য হয় তবে তো পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা প্রত্যেকেই এক একটি নেশন। ইতিমধ্যেই তাদের ব্যবহারে এর সূচনা পাওয়া যাচ্ছে। অসমীয়ারা খোলাখুলি বলছে যে বাঙালীরা বহিরাগত। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরাও বলাবলি করছে যে মাড়োয়ারীরা পাঞ্জাবীরা বিহারীরা ওড়িয়ারা দক্ষিণীরা বহিরাগত। একই মনোভাব মহারাষ্ট্রে, তামিল নাড়ুতে, ওড়িশায়, বিহারে। বহিরাগতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারলেই স্বদেশীর দাবী ওঠে। স্বদেশীকে সংরক্ষণের উদ্যোগ হয়। মানুষের ইতিহাসে এমনি করেই এক একটি রাজ্য এক একটি নেশন হয়ে যায়। ইউরোপের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

ঘটনাচক্রে এদেশে দুই দল বিদেশী এসে পর পর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ দেশের লোক হয়েছিল মোগলের অধীন, ব্রিটিশের অধীন। যে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা মোগলদের দ্বারা প্রবর্তিত তারই অভিনব সংস্করণ ইংরেজদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। দেশ ভাগ হয়ে গেলেও শাসনব্যবস্থা এখনো একটিমাত্র কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা কোনো রাজ্যেই বহিরাগত নন, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরাও কোনো রাজ্যেই বহিরাগত নন। তা যদি হয় তবে ব্যবসায়ীরা কী করে বহিরাগত হবে, শ্রমিকরাই বা বহিরাগত হবে কী করে? বিদেশযাত্রার জন্যে পাশপোর্টের দরকার হয়। অন্য রাজ্যযাত্রার জন্যেও কি পাশপোর্টের বা পারমিটের দরকার হবে? রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে ক'টাই বা চাকরি? সেক্ষেত্রে সংরক্ষণ সব রাজ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে তার চেয়ে অনেক বেশী চাকরি।

সেক্ষেত্রেও কি সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠবে? শেষে কি সৈন্যদলেও আঞ্চলিকতা প্রবেশ করবে না? তা যদি হয় তবে দেশ খণ্ড খণ্ড হতে কতক্ষণ? সেই জিনিসটিই হয়েছিল তুর্ক আক্রমণের পূর্বে। মোগল আক্রমণের পূর্বে। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে। দেশ খণ্ড খণ্ড হলে বিদেশীরাই সহজে দেশ অধিকার করে।

কে বহিরাগত, কে আদিনিবাসী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে রাজ্যও খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। আসামে আহোমরাও বহিরাগত। কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থরাও বহিরাগত। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসেও বার বার এরকম ঘটেছে। মুসলমানদের আসার আগে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থরা আসেন। দুই এক শতাব্দীর ব্যবধান। মুসলমানদের যদি বহিরাগত বলে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হয় তো কনৌজিয়াদেরও উত্তরপ্রদেশে পাঠানোর কথা উঠতে পারে। অবশ্য বহিষ্কার নীতি সেখানেই থামবে না। বহু লোক এসেছিল উত্তরপূর্ব থেকে। কেউ ইন্দোচীন থেকে, কেউ থাইল্যাণ্ড থেকে, কেউ আরাকান থেকে। দক্ষিণ থেকে যারা এসেছিল তাদের সংখ্যাও কম নয়। বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষ দক্ষিণাগত।

এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা হলো এক দেশের লোক অপর দেশে বস-বাস করলে ও সেই দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে সেই দেশের ন্যাশনালিটি পায়। পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম এক একটা দেশ নয়। এক একটা অঙ্গরাজ্য। ন্যাশনালিটি পরিবর্তনের প্রশ্ন অবান্তর। তবু যদি কে বহিরাগত ও কে নয় এরূপ কোনো প্রশ্ন ওঠে তবে পাঁচ বছরের অধিবাসিত্বই যথেষ্ট। তার উপর আর কোনো টেস্ট আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু কার্যত তাই দেখা যায়। অধিবাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার পরীক্ষায় পাশ করতে। সে পরীক্ষাকেও ইচ্ছা করে কঠিন করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র থেকে এ রকম অভিযোগ আমাদের নজরে এসেছে। তামিল নাড়ু তো আরো অসহিষ্ণু।

সম্প্রতি আসামে আবার বহিরাগতের প্রশ্ন উঠেছে। অসমীয়া ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হোক, এতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু একমাত্র মাধ্যম হলে আপত্তি। কারণ যাদের মাতৃভাষা অসমীয়া নয় তারা অসমীয়া ভাষায় পরীক্ষা দিলে কোথায় তলিয়ে যাবে। তখন তাদের ভবিষ্যৎ কী? এ কথা চিন্তা করেই বাঙালীরা বাংলা মাধ্যমের দাবী তুলেছে।

কিন্তু অসমীয়ারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে আসামে একমাত্র অসমীয়া ভাষাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন। ব্যতিক্রম হিসাবে কাছাড়ে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তার বাহন হতে পারে বাংলা। কাছাড় ইচ্ছা করলে আসাম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আসামের বাঙালীরা কিন্তু নাকের বদলে নরুন দিতে নারাজ। আসামের বাঙালীর ভবিষ্যৎ আর কাছাড়ের ভবিষ্যৎ তো এক নয়।

আসাম ভাঙতে ভাঙতে দিনকের দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভারতও কি ভাঙতে ভাঙতে আরো ছোট হবে? কে বহিরাগত ও কে নয় এ প্রশ্নের মীমাংসা না হলে রাজ্যে রাজ্যে সংঘাত বাধবে, তাই নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সংঘর্ষ বাধতে পারে। বিষয়টা অগ্নিগর্ভ। আমরা সবাই হিন্দু, অতএব আমরা সবাই এক, এ যুক্তি যে অকাট্য নয় তার প্রমাণ তো নেপাল। প্রমাণ আরো জমছে। নেশন বলতে তা হলে কী বোঝায়?

সারা ভারত জুড়ে হিন্দুদের তীর্থ বা পুণ্যস্থান। তেমনি সারা ইউরোপ জুড়ে খ্রীস্টানদের তীর্থ বা পুণ্যস্থান। সংস্কৃতই অধিকাংশ ভারতের মূলভাষা। তেমনি লাটিনও তো ইউরোপের মূলভাষা। কিছুদিন আগেও লাটিনেই সর্বত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলত। পৌরাণিক ঐতিহ্য আমাদের সব ক'টি সাহিত্যের পশ্চাদভূমি। তেমনি গ্রীক লাটিন ক্লাসিকাল ঐতিহ্যও ইউরোপের সব ক'টি সাহিত্যের পশ্চাদ্‌ভূমি।

এমনি আরো অনেক রকম সমান্তরালতা পাশাপাশি স্থাপন করা যায়। তা সত্ত্বেও ইউরোপ এক নেশন নয়। হতে চেষ্টা করেছিল। হয়নি। ভারত হয়েছে। কিন্তু বারো আনা রকম হয়েছে। ষোল আনা রকম হয়নি। হিন্দুর আদিভূমি যে সিন্ধু সেখানেই সে বিদেশী বা ম্লেচ্ছ। যে পঞ্চনদের তীরে বেদ রচিত হয়েছিল সেখানেই তার প্রবেশ নিষেধ। যদি না সে পাশপোর্ট ও ভিসা দেখায়।

তা হলে এও তো সেই ইউরোপের মতোই হলো। তফাৎটা শুধু এই যে ইউরোপে পঁচিশ ত্রিশটা নেশন, এখানে তিনটে। কালক্রমে এখানেও পঁচিশ ত্রিশটা হতে পারে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ এখানেও সক্রিয়। বাইরে থেকে ভিন্নভাষীরা এসে যদি জাঁকিয়ে বসে তবে তাদের মনে করা হয় উপনিবেশকারী। তারাও সেইরূপ আচরণ করে। হিন্দীভাষী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাংলাভাষী কর্মচারী বা কর্মপ্রার্থীদের অভিযোগ আমাদের কানে

এসেছে। তেমনি বাংলাভাষী কর্মীদের বিরুদ্ধে অসমীয়াভাষীদের। প্রত্যেকটি রাজ্যেই এখন একাধিক ভাষাগোষ্ঠী। কেউ বা আগন্তুক, কেউ বা চিরস্থায়ী। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যদি প্রবল হয় তবে নেশনের ভিতরে নেশন সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। ভারতেরই আর একটি রাজ্যে ভারতীয়রা হবে অনধিকারী। কেন্দ্র যদি রাজ্যের ভোটের মুখাপেক্ষী হয় তবে রাজ্যগুলিই কেন্দ্রকে বলবে হাত গুটিয়ে নিতে। তখন যা হবে তার নাম মালটিন্যাশনাল স্টেট। বিশ পঁচিশটি নেশনকে নিয়ে একটি সুপারনেশন। প্রত্যেকটি নেশন যে যার ঘরে সর্বেসর্বা। কাকে ঢুকতে দেবে কাকে দেবে না এটা হবে রাজ্যের মুখ্য ভাষাগোষ্ঠীর মর্জি।

বিপরীতটাও হতে পারে। কেন্দ্র একদিন চীনের মতো সর্বেসর্বা হয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। চীনদেশে নিম্নস্তরের স্টেট নেই। ওই একটাই স্টেট। সেটা উচ্চস্তরের। সকলেই সর্বত্র স্বাগত। কেউ বহিরাগত নয়। সরকার যাকে যেখানে খুশি বদলী করতে পারেন। চাকরি সবাই আশা করতে পারে, কিন্তু কোথায় পাবে সেটা প্রার্থীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সৈন্যদলে যোগ দিলে যেমন যেখানে দরকার সেখানে যেতে হয় অসামরিক বিভাগেও তেমনি। সব ক'টা চাকরিই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি।

ন্যাশনালিজম জিনিসটা মানব ইতিহাসে নতুন। ওর বয়স দু' শতকের বেশী নয়। নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের পর জার্মানরা হয়ে উঠতে চায় একটি নেশন, ইটালিয়ানরাও তাই। রাশিয়ানদের মনেও সেই বাসনা জাগে। একই ভাবধারা ভারতে এসে পৌঁছয়। প্রথমে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী, মরাঠা, পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদের। এর মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি ছিল। কেবল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নয়, প্রদেশে প্রদেশে. নেশন বলতে বাঙালী নেশন বোঝায়, না হিন্দু নেশন বোঝায়, না ভারতীয় নেশন বোঝায় এ নিয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ছিল। আমাদের যা স্বভাব, আমরা সব কিছুরই সমন্বয় চাই। যেন সমন্বয় এত সহজ। ফলে বিপরীতটাই ঘটে। বাঙালী নেশন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। হিন্দু নেশন সিন্ধু থেকে বিতাড়িত। আর ভারতীয় নেশন ভারতের বারো আনাকেই ভারত বলে পরিচিত করে, বাকী চার আনাকে পাকিস্তান বলে। পরে পাকিস্তান ভেঙে দু'টুকরো হয়। একভাগ পরিচয় দেয়

মুসলিম নেশন বলে, অপর ভাগ বাঙালী নেশন বলে। এই ভাবে ন্যাশনালিজমের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

এখন এইখানেই দাঁড়ি টানা উচিত নয় কি? এর পরে কি বাঙালী নেশন, অসমীয়া নেশন, তামিল নেশন, মহারাষ্ট্রীয় নেশন প্রভৃতির স্বপ্ন দেখা উচিত? কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হয় আমরা যে যার ভাষাগোষ্ঠীর ভিতরেই ভবিষ্যতের অন্বেষণ করছি। যেন ভাষাভিত্তিক রাজ্যের ভবিষ্যৎই আমাদের ভবিষ্যৎ। সমগ্রভাবে ভারতের কথা ভাবিনে তা নয়, কিন্তু সমগ্রের স্বার্থের উপরে খণ্ডের স্বার্থকে তুলে ধরি। এ দৃশ্য আমাদের প্রত্যেকটি রাজ্যে। দেখেশুনে মনে হয় আসলে আমরা পঁচিশটি কি ত্রিশটি নেশন। ইংরেজ না থাকলে, তার প্রতিপক্ষ হিসাবে কংগ্রেস না থাকলে, স্বাধীনতার সংগ্রাম দুই পুরুষ ধরে না চললে আমরা বলকান রাজ্যের মতো বহুধা বিভক্ত হতুম। কই, তুর্কী শাসন তো তাদের এক করতে পারেনি।

কংগ্রেস চিরকাল থাকবে না। তার জায়গায় ঠিক তেমনি একটি একচ্ছত্র দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। শূন্যতা পূরণ করতে পারে ভারতীয় সৈন্যদল। কিন্তু সরষের ভিতরেই যদি ভূত ঢোকে? সাম্প্রদায়িকতার মতো যদি প্রাদেশিকতা ঢোকে? ভারতীয় সৈন্যদল তো ১৯৪৭ সালেও ছিল। ভেঙে দু'খানা হল কেন? দুই নেশনতত্ত্বের মতো বহুনেশনতত্ত্বও দেশ ভেঙে দিতে পারে। এখন থেকেই কয়েকটি সতর্কতামূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে। বড়ো বড়ো কলকারখানা মাত্রেই হবে সর্ব ভারতের মিলনক্ষেত্র। যেমন জামশেদপুরে তেমনি রাউরকেলায় তেমনি ভিলাইতে তেমনি সালেমে তেমনি বিশাখাপত্তনমে তেমনি কোচিনে তেমনি তারাপুরে তেমনি আহমদাবাদে তেমনি কাণপুরে তেমনি হলদিয়ায় তেমনি ডিগবয়ে সর্বত্র সব ভাষাগোষ্ঠীর লোক থাকবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে সর্বভারতীয়। স্কুলগুলিও তাই।

নেশন বলতে এই বোঝায় যে একটি বিশেষ দেশে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর লোক আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ। চীনদেশে তাদের নাম চীনা, ভারতে তাদের নাম ভারতীয়। ইংলণ্ডে তাদের নাম ইংরেজ, জাপানে তাদের নাম জাপানী। নেশন কোথাও অতি বৃহৎ, কোথাও অতি ক্ষুদ্র। কেন এরকম হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া সহজ নয়। অন্যরকমও হতে পারত। ইংরেজরা আসাম জয় না করলে আসাম হয়তো পড়ে থাকত বর্মার দখলে, পরে বর্মীদের সঙ্গে নেশন গড়তে না পেরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হতো। বাঙালী সেখানে গিয়ে

বনবাস করত না, করলে অসমীয়া বনে যেত বা অসমীয়া প্রাধান্ত মেনে নিত। ইতিহাসের ধারা অন্ত খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তাই আসাম এসেছে ভারতীয় ইউনিয়নে, এখন আর বলা চলে না যে আসাম একটি বিশেষ দেশ ও অসমীয়ারা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। সুতরাং একটি নেশন। অথচ এটাও সত্য যে ওরা স্বতন্ত্র একটি নেশন হলেও হতে পারত। তেমনি বাঙালীরাও হতে পারত স্বতন্ত্র একটি নেশন। পঁচিশ বছর আগেও সেরকম একটা সম্ভাবনার উদয় হয়েছিল। বাঙালীরা সেদিন স্বেচ্ছায় দু'ভাগ হয়ে যায়। একভাগ পড়ে পাকিস্তানে, অপরভাগ পড়ে ভারতীয় ইউনিয়নে।

একবার একনেশনভুক্ত হবার পর সেই নেশনের মূলতত্বে কুড়ুল হানা যায় না। ভারতীয় বলে একটি জনগোষ্ঠীর সামিল হবার পর বাঙালী বা অসমীয়া বলে আর একটি জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে ভারতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া চলে না। বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে সুরক্ষিত সেখানে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠতে গেলে বিপদ। চীনদেশ সেইরূপ কোনো বিপদের আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন আর কোনো সরকারের অস্তিত্বই সহ্য করেনি। ভারত এবিষয়ে চীনের চেয়ে উদার। কিন্তু ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা দেখলে উদার থাকবে না। নয়তো ভেঙে চৌচির হবে। দেশরক্ষার দায়িত্বও ভাগ হয়ে যাবে।

যারা স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি, অর্জন করতে পারত না, রক্ষা করতে পারবে না তাদের পক্ষে স্বতন্ত্র একটি নেশন হতে চাওয়া কেবল তাদের পক্ষে নয়, তাদের প্রতিবেশীদের পক্ষেও বিপজ্জনক। অমনি করে ভারত বিদেশীদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। আমাদের সকলের দেশরক্ষার ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য। সেইজন্যে আমরা এক নেশন। মুসলিম লীগ অবুঝ, তাই দুই নেশনে পরিণত হতে হলো। দুই থেকে তিনও ছিল অপরিহার্য, কারণ পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থলপথে ও আকাশপথে যোগসূত্র ছিল না। কিন্তু তিন থেকে চার অপরিহার্য নয় সমস্ত শক্তি দিয়ে একে প্রতিহত করতে হবে।

স্বাধীনতার পরে কী

দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন আমরা সকলেই একমত ছিলুম যে পরাধীনতার পর স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার পর কী? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে এক একজন উত্তর দিতেন এক একভাবে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন রাজতন্ত্রে, কতক প্রজাতন্ত্রে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে, কতক একনায়কতন্ত্রে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে, কতক পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন ধনতন্ত্রে, কতক সমাজতন্ত্রে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন কেন্দ্রীকরণে, কতক বিকেন্দ্রীকরণে। কতক লোক বিশ্বাস করতেন শিল্পায়নে, কতক চরকায়।

ভারতের পূর্বেও বহু দেশ স্বাধীন ছিল বা হয়েছিল। তারা সবাই যে একই ছাঁচে ঢালা তা নয়। স্বাধীন হলে ভারত কোন্ দেশের অনুসরণ করবে? না অন্য কারো অনুসরণ না করে নতুন একটা দৃষ্টান্ত দেখাবে? মহাত্মা গান্ধী যা চেয়েছিলেন তা তিনি তাঁর ১৯০৯ সালে লেখা "হিন্দ্ স্বরাজ" নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তখনও তিনি দেশের নেতা হননি, দেশের নাড়ী টিপে বুঝতে পারেন নি দেশ কী চায়। সংগ্রামে নেমে বিভিন্ন সহকর্মীর সঙ্গে মিশে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে অন্যান্য দেশের খোঁজখবর নিয়ে তাঁর থীসিসের শোধন করেন। তবে তিনি তাঁর মতবাদ জোর করে চাপাতে চাননি। জানতেন যে তা করতে গেলে দল ভেঙে যেত। যতদিন দেশ স্বাধীন হয়নি ততদিন স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদের জন্যে দলীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি কংগ্রেসের উপর গান্ধীবাদ চাপিয়ে না দিয়ে নিজে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন।

কেন্দ্রীকরণ, আমলাতন্ত্র, সৈন্যদল, জেল, পুলিশ, আইন আদালত প্রভৃতি না হলে রাষ্ট্র টিকতে পারে না। আইনের জন্যে আইনসভাও চাই। আইনসভার নির্বাচনও চাই। নির্বাচন প্রত্যক্ষ নির্বাচন হওয়া চাই। এসব বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত তাঁর সহকর্মীরা বিনা বিচারে মেনে নিতে পারেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হলেও তাঁরা ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির বিরোধী

ছিলেন না, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের তো নয়ই। ইংরেজকে বিদায় দেওয়া মানে তাঁদের মতে এ নয় যে দুই শতাব্দীর অগ্রগতিকেও বিদায় দিতে হবে। তেমনি শিল্পায়নকেও তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। তবে সেটা ধনতান্ত্রিক পন্থায় হবে, না সমাজতান্ত্রিক পন্থায় হবে এ নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ ছিল। গান্ধীজী তো শিল্পায়নই চাননি। তিনি এমন এক ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেটা ধনতন্ত্রও নয়, সমাজতন্ত্রও নয় অথচ সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই পঁচিশ বছরে মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে যে স্বাধীনতার পরে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ও তার পরে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য স্থির হয়ে যাওয়া এক জিনিস আর লক্ষ্যে পৌছানো আরেক জিনিস। স্বরাজ যে ভারতের লক্ষ্য এটা তো কংগ্রেসের ১৯০৫ সালের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজীর মুখে শোনা যায়। কোথায় ১৯০৫ সাল আর কোথায় ১৯৪৭ সাল! মাঝখানে সুদীর্ঘ সংগ্রাম। কঠোর সাধনা। শুধুমাত্র আইন পাশ করে স্বরাজ হয়নি। হবার নয়। শুধুমাত্র আইন পাশ করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রও হবে না। হবার নয়। বিস্তর লোককে বিস্তর ত্যাগ করতে হবে, বহুকাল তপস্যা করতে হবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

যাঁরা সময়সংক্ষেপ করতে চান তাঁরা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের পথ ধরেন না। তাঁরা ধরেন বিপ্লবের পথ। তেমন দলও এদেশে আছে। কিন্তু কংগ্রেস কখনো বিপ্লবের পথ ধরতে পারে না। তার ঐতিহ্য অন্যরূপ। কংগ্রেসের উপর যাদের আস্থা আছে তারা সময়ের প্রশ্নটা কংগ্রেস নেতাদের উপরে ছেড়ে দিয়েছে। নেতারা যদি মনে করেন যে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের পথে আরো দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব তা হলে আরো দ্রুত অগ্রসর হবেন। যদি মনে করেন আরো দ্রুত অগ্রসর হতে হলে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে, দল ভেঙে যাবে, গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে তা হলে গতিবেগ সংবরণ করবেন।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা অন্যান্য দেশেও হয়েছে বা হচ্ছে। কোথাও সেটা নিষ্কণ্টক নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর সোশিয়াল ডেমক্রাট পার্টি অনেকদূর এগিয়ে যায়, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে না। সদিচ্ছার অভাবে নয়, সব দিক থেকে বাধা পেয়ে। একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির বেলা। পার্লামেণ্টে মেজরিটি থাকলে

আইন পাশ করিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া মোটেই সহজ নয়। মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে সরকারী ব্যয় নির্বাহ করতে গেলে মজুরি বাড়িয়ে দেবার দাবীতে ধর্মঘট বেধে যায়। ধর্মঘটীদের দাবী মেটাতে গিয়ে আরো বেশী মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে আরেক দফা ধর্মঘট। কলমের এক খোঁচায় প্রাইভেট সেকটরকে পাবলিক সেকটরে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু কাগজের নোট ছাপিয়ে ক্ষতিপূরণ ও মজুরির বিল মেটাতে গেলে ধনিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীকেই শত্রু করা হয়। ধনিকরা বনে যায় ফাসিস্ট। শ্রমিকরা কমিউনিস্ট। জার্মানীতে সেটা দেখা গেল ত্রিশের দশকে। স্পেনে এখনো তার অস্তিত্ব রয়েছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে রক্ষণশীলরাই ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। তারা গণতন্ত্রী। কিন্তু সমাজতন্ত্রী নয়।

ভারতের মতো দেশে ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পাবলিক সেকটর যতই বাড়ানো যাক প্রাইভেট সেকটরের শূন্যতা ভরানো যাবে না। প্রাইভেট সেকটর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পাঁচ বছর বা দশ বছর বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নয়। ইংরেজকে "চলে যাও" বলা যত সহজ ছিল নিজের দেশের প্রাইভেট সেকটরকে "হটে যাও" বলা তত সহজ নয়। সে দায়িত্ব কংগ্রেস নিতে পারে না। কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা সেইখানে। কংগ্রেসকে অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে। নয়তো আবার দল ভেঙে যেতে পারে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের কাছে যত না কমিটেড তার চেয়েও বেশী গণতন্ত্রের কাছে। এর অন্যথা ঘটলে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী পৃথক হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। সব দিক সামলাতে হলে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। বিলম্বে কার্যসিদ্ধি।

গান্ধীজী থাকতেই কংগ্রেসের ভিতরে তিনটি ধারা ছিল। একটি তো গণতন্ত্রী ধারা, যার প্রতিভূ বল্লভভাই। আর একটি সমাজতন্ত্রী, যার প্রতিভূ জবাহরলাল। তৃতীয়টি গান্ধীবাদী, যার প্রবক্তা স্বয়ং গান্ধী। গান্ধীবাদীরা এখন বিনোবাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বাইরে। তাঁরা নির্বাচনে যোগ দেন না, লোকসভায় বা বিধানসভায় যান না, সরকার গঠনে অংশ নেন না। বিরোধী-পক্ষেও তাঁরা নেই। তাঁরা তাঁদের স্বকীয় পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত তথা শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। রাষ্ট্র বলে যদি কিছু থাকে তবে বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থায় থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ। বাদবাকী তুলে দেওয়া হবে রাজ্যগুলির হাতে। রাজ্যও নিজের

ক্ষমতার কতক অংশ হাতে রেখে বাকীটা ছড়িয়ে দেবে গ্রামে গ্রামে। চূড়ান্ত অধিকার থাকবে গ্রামিকদের হাতে। তারা ভোটাধিকার তো পাবেই, উপরন্তু পাবে তাদের নিজেদের ব্যাপার পরিচালনার অধিকার।

গান্ধীবাদীদের বর্তমান ভূমিকা ও কংগ্রেসের বর্তমান ভূমিকা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন না হলেও উদ্দেশ্য ও উপায় নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আরো গভীর হয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র চাই-ই চাই। এটাই সব দেশের অভিজ্ঞতা। এই নিয়ে মার্কসের সঙ্গে বাকুনিনের বিরোধ। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা যদি শিথিল করা হয় তবে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকে না, কেন্দ্রীকরণেরও না। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে তার দায়িত্ব নিতে পারতেন, বিনোবাজী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তার দায়িত্ব নেবেন, কিন্তু পরে এ দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে তা বলা শক্ত। কারণ বিনোবাজী আবার পার্টি গঠনে বিশ্বাস করেন না। পার্টিশূন্য রাজনীতি তো আমরা দুনিয়ার কোনো-খানেই দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে দেখছি সেখানে সামরিক একনায়কত্ব। পার্টিশূন্য সমাজতন্ত্র বা পার্টিশূন্য গণতন্ত্র যে ভারতে সম্ভব হবে, এমন নিশ্চয়তা কে দেবে ?

সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী পার্টির বিকল্প সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী আর্মি। দ্বিতীয়টার উপর বরাত দিলে গণতন্ত্রও হবে না, সমাজতন্ত্রও হবে না। তাই প্রথমটার উপরেই বরাত দিতে হবে। সেটা কংগ্রেস না হয়ে অন্য কোনো পার্টিও হতে পারে। তবে সংবিধানকে অস্বীকার করলে বা এড়িয়ে গেলে চলবে না। সংবিধানকে স্বীকার করে তার বিধিমতো সংশোধন করে অভীষ্টের অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। এ সংবিধান দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাবার ফলে লাভ করা গেছে। এর পেছনে দেশবিদেশের বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। এর মূলোচ্ছেদ করা নির্বুদ্ধিতা। এর মূল যাতে আরো দৃঢ় হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে।

সাম্যের কথা

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। যারা প্রত্যক্ষভাবে অধীন ছিল না তারাও কার্যত অধীন ছিল। মহাযুদ্ধের ধাক্কায় রুশ সাম্রাজ্য, তুর্কী সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একরাশ পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়ে লীগ অফ নেশনসে যোগ দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় আরো কয়েকটি সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। ব্রিটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ান, ডাচ, জাপানী সাম্রাজ্য আর নেই, তবে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে নি। আরো একরাশ পরাধীন দেশ এবার স্বাধীন হয়ে ইউনাইটেড নেশনসে যোগ দিয়েছে। তবে এমন কতকগুলি দেশ আছে যারা কার্যত স্বাধীন নয়। তাদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ। সেসব দেশে প্রায়ই গোলমাল লেগে রয়েছে।

স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় দেশের স্বাধীনতা তবে সে প্রশ্নের মীমাংসা একরকম হয়ে গেছে। যেটুকু বাকী আছে সেটুকুও এই শতাব্দীর মধ্যেই মিটে যাবে বলে মনে হয়। সাম্রাজ্যবাদীদেরও অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে। তারা আর সাম্রাজ্যের দিকে না তাকিয়ে প্রতিবেশীর দিকে তাকচ্ছে। কমন মার্কেট বা ইকনমিক কমিউনিটি গড়ে তুলছে। পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী আগেকার দিনের জার্মানীর চেয়ে ছোট। তার সাম্রাজ্যও নেই। তবু তার মতো সমৃদ্ধ দেশ পশ্চিম ইউরোপে তো নেইই, পৃথিবীতেও কম আছে। জাপানও আগেকার দিনের জাপানী সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছু নয়। অথচ তার মতো সমৃদ্ধ দেশ এশিয়ায় তো নেইই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরেও আর নেই। চীনের সঙ্গে এখন সে একটা বন্দোবস্ত করতে চায়। ফলে তার সমৃদ্ধি আরো বেশী বেড়ে যাবে।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতাই স্বাধীনতার সব কথা নয়। দেশ যেমন স্বাধীন ব্যক্তিও কি তেমনি স্বাধীন? পুরুষ যেমন স্বাধীন নারীও কি তেমনি স্বাধীন? উচ্চবর্ণের লোক যেমন স্বাধীন নিম্নবর্ণের লোকও কি তেমনি স্বাধীন?

উচ্চবিত্তরা যেমন স্বাধীন নিম্নবিত্তরাও কি তেমনি স্বাধীন? শ্বেতকায়রা যেমন স্বাধীন কৃষ্ণকায়রাও কি তেমন স্বাধীন? স্পৃশ্যরা যেমন স্বাধীন অস্পৃশ্যাও কি তেমনি স্বাধীন? মালিকশ্রেণী যেমন স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণীও কি তেমনি স্বাধীন?

এসব প্রশ্নের ভিতরে রয়েছে একটিমাত্র প্রশ্ন। সেটি সাম্যের প্রশ্ন। সবাই সমান স্বাধীন নয়। সবাই সমান অধিকারী নয়। সবাই সমান সুযোগ পায় না। সবাই সমান সুবিধাভোগী তো নয়ই।

কিন্তু আরো একরকম সমান তো আছে। সমান কর্তব্য, সমান দায়িত্ব, সমান যোগ্যতা, সমান শক্তি, সমান ত্যাগ। সাধারণত এদিকটা কেউ গণনার মধ্যে আনতে চান না। কিন্তু আনা উচিত। গুরুভার লোকে বইতে যাবে কেন যদি লঘুভার বইলেও সমান পারিশ্রমিক পায়? মিছরি উৎপাদন করে মুড়ির দর যদি পায় তবে মিছরি উৎপাদন করবে কেন? যে সব দেশে সমাজ-বিপ্লব ঘটে গেছে সেসব দেশ এখন এই নিয়ে ভাবনায় পড়েছে। কয়েকটি পুরাতন শ্রেণী একদা যে গুরুভার বহন করত সে ভার বহন না করেও সেই সব সুবিধা ভোগ করত, তাই তাদের অপসারণের ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল। যেখানে তারা সুবিধা বা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে সেখানে অপসারিত হয় নি। ইংলণ্ডের রাজপরিবার এখনো জনপ্রিয়, জাপানের রাজপরিবার তো আরো। ইংলণ্ডের লর্ডদের দলে কমনাররা বরাবরই প্রবেশ পেত। আজকাল শ্রমিকরাও পাচ্ছে। অপরপক্ষে কমনস সভায় নির্বাচনের অধিকার লাভের জন্যে লর্ড উপাধি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন অতি সম্ভ্রান্ত লর্ড।

সাম্যের দাবীতে বিপ্লব ঘটালে পরে আবার সেই দাবীর মুখোমুখি হতে হয়। দাবী তোলে অপর এক শ্রেণী। কারণ এটা তো স্পষ্ট যে বিপ্লব পুরাতন সুবিধাভোগী শ্রেণীকেই সরিয়ে দেয়, নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীকে উপরে ওঠার সুযোগ করে দেয়। সবাইকে সমান বলে ঘোষণা করলেও কার্যত সবাই সমান হয়ে যায় না। সামরিক বিভাগে ধাপের পর ধাপ। অসামরিক বিভাগেও তাই। কলকারখানায় থাকের পর থাক। সমষ্টিগত ক্ষেতখামারেও তাই। ক্রয়ক্ষমতা সকলের সমান নয়। ক্রয়যোগ্য সামগ্রীরও রকমারি দাম: মুড়ি মিছরির এক দর নয়।

একবার যারা উপরে উঠেছে তারা সদলবলে সেখানে থাকবার আয়োজন করে নেবেই। তাদের ছেলেমেয়েদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করতে

চাইবেই। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইতিহাসে বার বার এ রকম দেখা গেছে। বার বার দেখা যাবে। সন্ন্যাসীরা যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ সেখানে তাঁরাও এর উর্ধ্বে নন। শঙ্করাচার্যের দশনামীরা নাকি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাউকে সন্ন্যাস দেন না। ইদানীং হয়তো কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে। মোহন্ত-মহারাজদের চেলা মহারাজরা তাঁদেরই নিকট আত্মীয়। পোপদের ও কার্ডিনালদের আত্মীয়পোষণ তো ইতিহাসবিশ্রুত। আমাদের এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে এই অভিযোগটি আমার কানে আসে যে, তাঁর মতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য না হলে নাকি বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি হয় না। তার মানে অন্যরা নিম্ন অধিকারী। এ ধরনের অভিযোগ আগেও শুনেছি, পরেও শুনেছি। সমাজবিপ্লবের পরেও শুনব। চীনেও শোনা যাচ্ছে। সেইজন্যই তো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। নিম্ন অধিকারীরা উচ্চ অধিকারীদের তিষ্ঠতে দিবে না।

ফরাসী বিপ্লবের সময় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে সামধ্বনি ওঠে তা দিকে দিকে প্রসারিত হয়। সাম্য যাঁদের কাম্য তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও জীবনের বিভিন্ন বিভাগে তার প্রয়োগ দেখতে চান। হিন্দুসমাজে পতিরা যদি সহমরণে না যায় সতীরা কেন সহমরণে যাবে? পতিদাহ যদি প্রচলিত না থাকে সতীদাহ কেন প্রচলিত থাকবে? বিপত্নীকেরা যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে তবে বিধবারা কেন তা পারবে না? এই হলো রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন। এই দুই সমাজসংস্কারক যে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন সে প্রশ্ন নরনারীর সাম্যের প্রশ্ন। সমান অধিকারের সমান ব্যবহারের প্রশ্ন। একই কারণে পুরুষের বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও আপত্তি। পুরুষের বহুবিবাহ আগেকার দিনে কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকত না। কারণ বৈষম্যই ছিল সর্বজনস্বীকৃত নীতি বা রীতি, যেমন পরাধীনতা ছিল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ভাগ্য। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আওয়াজ যাদের কানে গেছে তাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকবেই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজেও নারী ও শূদ্রের বেদাধিকার ছিল না। বেদীতে আচার্য হবার অধিকার ছিল না। শূদ্র না বলে ব্রাহ্মণেতর বলাই সঙ্গত। কেশবচন্দ্র তাই আলাদা এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সেখানে জাতের বিচার থাকে না। ব্রাহ্ম যারা তারা কেউ ব্রাহ্মণও নয়, কেউ অব্রাহ্মণও নয়, সকলেরই সমান অধিকার। যে কোন ব্রাহ্ম আচার্য হতে পারেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙলা ব্যবহার করতে পারেন। একই অধিকার ব্রাহ্মিকাদেরও দেওয়া হয়। সাম্যবাদী ভাবনাই ব্রাহ্মসমাজকে দু'ভাগ করে

দেয়। পরে আরো এক ভাগ হয়। সেটার মূলে একনায়কতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজও একই প্রকার সাম্যবাদী। হয়তো আরও বেশী সাম্যবাদী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা মেডিক্যাল কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে সহশিক্ষা প্রবর্তন করেন। এটা কেবল ভারতে নয়, ইউরোপের অগ্রগামী দেশগুলিতেও তখনকার দিনে অভিনব।

নারীও স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে ও বিবাহবিচ্ছেদ দাবী করতে পারে, এটাও ইউরোপের মতো ভারতে স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে পরে হিন্দু সমাজে। এটাও সেই সাম্যবাদী ভাবনার অন্যতম ফল। হিন্দুসমাজের ভিতরে থেকেই শূদ্ররা উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করে, অস্পৃশ্যরা জাতে উঠতে চেষ্টা করে। দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণ আন্দোলনের মর্মকথা সাম্য। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের প্রেরণাও তাই। তাঁর স্বাধীনতার সাধনার পাশাপাশি চলেছিল সাম্যের সাধনা। সেবাগ্রাম আশ্রমে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় তা'র একটি ছিল বর্ণহিন্দুর বিবাহে হরিজনকে পুরোহিত করা, আর একটা ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে হরিজন পাত্রের বিবাহ দেওয়া। সনাতনীরা তো তাঁর মৃত্যু কামনা করবেই।

সাম্যের আর এক নাম সামাজিক ন্যায়। সামাজিক ন্যায়ের অভিমুখে আমাদের দেশ বেশ কিছুদূর এগিয়ে রয়েছে। তবে পথ এখনও অনেক বাকী। আধুনিক পরিভাষায় সামাজিক ন্যায় বলতে যা বোঝায় তা সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর সুবিধা লোপ আর অক্ষমতাভোগী শ্রেণীগুলির অক্ষমতা দূরীকরণ। এক হাতে অন্যায় সুবিধা দূর করতে হবে। অপরের হাতে অন্যায় অক্ষমতা দূর করতে হবে। এই দুটি করণীয় কাজ যদি সময়মতো করা হয় ও ভদ্র উপায়ে করা হয় তবে বিপ্লবের আবশ্যক হয় না। নয়তো একদিন বিপ্লব আপনি এসে পড়ে। সেদিন রক্তের স্রোত বয়ে যায়।

কিন্তু যা কিছু সোনার মতো চকচক করে তাই সোনা নয়। যা কিছু রক্তক্ষয়কারী তাই বিপ্লব নয়। মানুষের সমাজে সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি বা দল চিরকাল ছিল ও আছে। তাদের দ্বারা প্রকাশ্য বা গোপন রক্তপাত বড়ো কম হয়নি। কিন্তু কেউ তাকে সমাজবিপ্লব বলে ভুল করে না। সমাজবিপ্লব হলে তার লক্ষণ হতো সুবিধাভোগী শ্রেণীর সুবিধালোপ ও অক্ষমতাভোগী শ্রেণীর অক্ষমতা অপসারণ। নাৎসীরাও তো বলত যে তারা একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটা আর যাই হোক সমাজবিপ্লব নয়।

মানুষকে প্রাণে না মেরেও তার সুবিধা লোপ করা যায়। তাকে সমূলে বিনাশ না করেও তার ক্ষমতা হরণ করা যায়। আস্ত একটা শ্রেণী কি সামান্য দশ বিশ হাজার মানুষ? ওরাই বা কেন ধনে প্রাণে উচ্ছন্ন হবে? ধন কেড়ে নিতে হয় কেড়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রাণ কেড়ে নিয়ে এমন কী লাভ হবে? আজকের দিনে যাকে বুর্জোয়া শ্রেণী বলা হয় তার সদস্যসংখ্যা কালকের দিনের রাজন্য বা জমিদার শ্রেণীর সদস্যসংখ্যার মতো বিশ ত্রিশ হাজার নয়। দশ বিশ লক্ষ বললেও কম করে বলা হয়। এদের তাড়িয়ে দিলে এরা যাবে কোথায়? এদের প্রাণে মারলে এরাও তো আত্মরক্ষার তাগিদে প্রাণ নেবে? দেশের ফৌজ যদি এদের পেছনে না দাঁড়ায় বাইরের ফৌজ তো উড়ে আসতে পারে।

বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি। দেশীয় রাজন্য ও জমিদার শ্রেণীর মতো তারা একটা অতি পুরাতন শ্রেণী নয়। ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে তাদের বয়স পাঁচশো বছরও নয়। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজের পত্তনের পূর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। এই নতুন শ্রেণীটি প্রধানত নিচের থেকে উঠেছে। উপরের থেকেও কতক পরিবার প্রভাব প্রতিপত্তি ধনসম্পদ হারিয়ে এই শ্রেণীতে নেমে এসেছে। এই শ্রেণীর প্রাণশক্তি যদিও কৃষক শ্রমিকদের তুলনায় ক্ষীণ তবু এর হাতেই সভ্যতা, এর হাতেই সংস্কৃতি, এর হাতেই প্রশাসন, এর হাতেই রাজনীতি ও অর্থনীতির সংগঠন। সামরিক শক্তিও এরই নিয়ন্ত্রণে। ঘোরতর এক জাতীয় সঙ্কটে এর হাত থেকে ক্ষমতা খসে পড়তে পারে, কিন্তু তেমন একটা সঙ্কট কেউ তার মর্জিমতো সৃষ্টি করতে পারে না। বিপ্লব হবেই এটা অনিবার্য নয়। বিপ্লব হবে না, এটাও ধ্রুব সত্য নয়।

গণতান্ত্রিক উপায়ে বুর্জোয়াদের সুবিধা হরণ করলে ওরাও একদিন দেশীয় রাজন্য ও জমিদারের মতো তলিয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে যে বুর্জোয়াদের ধনসম্পত্তি বণ্টন করে দিলেও অক্ষমতাভোগীদের অক্ষমতা দূর হবে না। শ্রমিক কৃষকদের চেয়েও অক্ষমতাভোগী রয়েছে। তারা ভূমিহীন ও গৃহহীন। তাদের চেয়েও অক্ষমতাভোগী যারা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘোরে। যেমন পাঁচ হাজার বছর আগে ঘুরত। তাছাড়া এটাও কি সত্য নয় যে শহরের শ্রমিকদের তুলনায় গ্রামের শ্রমিক ও কৃষকরা অক্ষমতাভোগী? বুর্জোয়াদের পতন হলেই যে এদের সকলের সমান উত্থান হবে তা নয়।

তারপর ধনসাম্যই কি একমাত্র সাম্য? জ্ঞানসাম্য, বলসাম্য, শ্রমসাম্য, প্রেমসাম্য এসবও কি সাম্য নয়? এসবও কি কাম্য নয়? ধন অনুসারে সমাজকে ভাগ করা প্রাচীন বা মধ্যযুগের রীতি ছিল না। এটা আধুনিক যুগেরই রীতি। বুর্জোয়ারাই এর প্রবর্তন করেছে। জ্ঞান, বল, ধন, শ্রম— এই চারটিকে নিয়েই সেকালের চার বর্ণ বা শ্রেণী। তাতে শ্রমকে দেওয়া হয়েছিল সব চেয়ে নিচু স্থান। সেটা অন্যায়। একালে ধনকেই সব চেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া হচ্ছে। এটাও অন্যায়। তা ছাড়া চাতুর্বর্ণ্য চার চারটে মনোপলি সৃষ্টি করেছিল। এক শ্রেণীর হাতে জ্ঞানের মনোপলি। আরেক শ্রেণীর হাতে বলের মনোপলি। আরেক শ্রেণীর হাতে ধনের মনোপলি। আরেক শ্রেণীর হাতে শ্রমের মনোপলি। শিল্পবিপ্লব এসে এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করেছে। শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, পার্লামেন্টারি নির্বাচনে ভোটাধিকার, লেবার পার্টির হাতে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার ইংলণ্ডে যেসব পরিবর্তন এনেছে ভারতেও সেসব সম্ভবপর।

শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা এখন সরকারী খরচে মধ্যশিক্ষা পায়, তাদের অনেকেই বৃত্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এইভাবে জ্ঞান একালে সমাজের সব শ্রেণীতে ছড়িয়ে পড়ছে। সেকালের মতো একটি শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। পার্লামেন্টে শ্রমিকরাও প্রতিনিধি পাঠায়, সংখ্যায় বেশী হলে তাঁরা সরকার গঠন করেন। সিভিল সার্ভিসেও, সৈন্যদলেও তাঁদের ক্ষমতা খাটে। এসব ক্ষেত্রেও শ্রমিকঘরের জ্ঞানবান বা গুণবান পুত্ররা প্রবেশ পায়। ক্ষমতাও এখন সেকালের মতো একটি শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। জ্ঞানের মতো ক্ষমতাও এখন সব শ্রেণীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাকী থাকে ধন ও শ্রম। দ্বন্দ্বটা এই দুটি নিয়েই। ধনীর ছেলেরা শ্রমের অংশ নিতে নারাজ। শ্রমিকের ছেলেরা ধনের অংশ যা পাচ্ছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্যে কয়েকটি দেশে এখন কলকারখানায় শ্রমিকদের অংশীদার করে নেওয়া হচ্ছে। পরিচালনাতেও তাদের প্রতিনিধিদের হাত থাকছে। ধনতন্ত্র যদিও সমাজতন্ত্র নয় তবু শ্রমিককে লাভের ভাগ দিয়ে তার সমর্থন পাচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকরা হয়ে উঠেছে ধনতন্ত্রের স্তম্ভ। জাপানের শ্রমিকরাও। তবে সবাইকে সঙ্গে নিতে পারা যাচ্ছে না। অসন্তোষও ধূমায়িত হচ্ছে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে ধনও এখন সেকালের মতো একটি শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। জ্ঞানের মতো ক্ষমতার মতো সব শ্রেণীতে

ছড়িয়ে যাচ্ছে। কোথাও কম, কোথাও বেশী।

কিন্তু শ্রমের অংশ কি শ্রমিকভিন্ন অপরাপর শ্রেণীর লোক নিচ্ছে? শ্রমও কি সব শ্রেণীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে? সে কি এখনো একটি শ্রেণীতেই নিবদ্ধ নয়? এখানেই ধনতন্ত্রের দুর্বলতা। ধনীর ছেলেরা শ্রমিক হবে না, শ্রমের অংশ নেবে না। শ্রমিকের বোঝা হালকা করবে না। খ্রীষ্টীয় সাধুদের আদর্শ, বৌদ্ধ সাধুদের আদর্শ, গান্ধীজীর আদর্শ এখানে ওখানে দু'চারজন গ্রহণ করলেও শ্রমিকের বোঝা হালকা করতে অন্যান্য শ্রেণীর লোকের আন্তরিক আগ্রহ নেই। বোঝাটা তারা চাপাতে চায় যন্ত্রের ঘাড়ে। বোঝা হয়তো কিছু হালকা হয়, কিন্তু ধনীরা শ্রমিকদের শ্রমের অংশীদার হয় না। জ্ঞানীরাও কি তাদের শ্রমের অংশীদার হয়? না, তারাও তাতে নারাজ। ক্ষমতাশালীরাও কি তাদের শ্রমের অংশীদার হয়? না, তারাও তাতে অনিচ্ছুক। কেউ যদি শ্রমিকের শ্রমভাগ না নেয় তা হলে শ্রমই হয় শ্রমিকের মনোপলি, অবাঞ্ছিত মনোপলি। তা হলে তার স্থানও হয় সবচেয়ে নিচুতে।

শ্রমের স্থান উচ্চতর না হলে, অন্যেরা স্বেচ্ছায় শ্রমের ভাগ না নিলে এমন একদিন আসবে যেদিন মিলিটারী কনসক্রিপশনের মতো লেবার কনসক্রিপশনও চালু হবে। একভাবে না একভাবে জ্ঞানের মতো, ক্ষমতার মতো, ধনের মতো শ্রমও সব শ্রেণীতে ছড়িয়ে পড়বে।

বিপ্লব বলতে কী বোঝায়

বিপ্লব কথাটা মানুষের ইতিহাসে নতুন নয়। কিন্তু আগেকার দিনে তার অর্থ ছিল রাষ্ট্রবিপ্লব। রাষ্ট্রবিপ্লব এখনো মাঝে মাঝে ঘটে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে শব্দটির অর্থ পালটে গেছে। বিপ্লব বলতে আজকের দিনে বোঝায় রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক বিপ্লব। রাষ্ট্রিক না হয়ে সামাজিক হতে পারে না। সামাজিক না হয়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক হওয়াও উদ্দেশ্যহীন।

সামাজিক বিপ্লবই আসল লক্ষ্য। সমাজকে রাষ্ট্রের সাহায্যে এমনভাবে ঢেলে সাজতে হবে যার ফলে শোষিত শ্রেণীর জনগণ আর শোষিত হবে না। শোষকশ্রেণীর হাতে আর শোষণের উপায় থাকবে না। শোষকরা সুদ পাবে না, মুনাফা পাবে না, জমির খাজনা পাবে না, ফসলের ভাগ পাবে না, বাড়ীর ভাড়া পাবে না। সম্পত্তির থেকে তাদের কোনো আয় হবে না। অপরকে তারা খাটাতে পারবে না। অপরকে খাটিয়ে তাদের কোন লাভ হবে না। শোষকদের যা আছে থাকবে না, তার জন্যে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। দিলেও একহাতে যা দেওয়া হবে আরেক হাতে তা কেড়ে নেওয়া হবে। কিছুদিন বাদে দেখা যাবে শোষিতদের সঙ্গে শোষকদের কোনো তফাৎ নেই। সকলের একই অবস্থা। তখন সমাজ হবে শ্রেণীশূন্য সমাজ।

গত পঞ্চাশ বছর আগে রাশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটেছে সেই বিপ্লবই একালের বিপ্লবীদের চোখে সামাজিক বিপ্লবের মানসচিত্র। কারো কারো মতে রাশিয়ানরা শোধনবাদী হয়েছে। শোধনবাদী হওয়াটা নাকি বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাওয়া। কিন্তু যাঁরা একথা বলেছেন তাঁরাও কি শোধনবাদী না হয়ে চিরদিন থাকতে পারবেন? তাঁদের ঘরেও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আরেকদল অতিবিপ্লবী রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা চায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দেখা যাচ্ছে সামাজিক বিপ্লবই শেষ কথা নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবও চাই। শ্রেণীশূন্য সমাজকে হতে হবে সংস্কৃতিশূন্য সমাজ। কতকগুলো লোক কেনই বা বেশী পড়াশুনা করবে, বিদ্বান হবে? হলে তো তারাই বেশী মজুরি পাবে। তা

হলে আর সাম্য হল কী করে? শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বলে দুটো শ্রেণী তো রয়েই গেল। মজুরিরও তারতম্য ঘটল।

সাম্যবাদীরা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন, সম্পত্তিশালীদের কোতল করেছেন বা খেদিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা খনি ও খামার চালাবার জন্য অসংখ্য ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ সিভিল ও মিলিটারী কর্মী তথা বৈজ্ঞানিক নিয়োগ করেছেন। এঁরা যা পারিশ্রমিক পান তা সাধারণ কর্মীদের চেয়ে বেশী। এই নিযে চেকোস্লোভাকিয়াতে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়।

যতদূর জানতে পেরেছি চেকোস্লোভাকিয়ার সাধারণ শ্রমিকরা যদি আঠারো শো পায় তো ইঞ্জিনীয়ারদের আপত্তি। আমরা এত লেখাপড়া করে, এতগুলো পরীক্ষা পাশ করে, ঘরের খেয়ে, ঘরের টাকা খরচ করে ইঞ্জিনীয়ার হলুম। ওরা ওসব কিছুই করল না, সে যোগ্যতাই ওদের নেই। তবু ওরা পাবে আঠার শো, আমরা পাব বাইশ শো, কতটুকু তফাৎ?

এ সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে করতে হবে। কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করলেও ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ার ও পিওন একই রকম পারিশ্রমিক পেতে পারে না। তারতম্য থাকবেই। সে তারতম্য চেকোস্লোভাকিয়ার মতো হলে ম্যানেজারদের আপত্তি হবে। তাদের সবাইকে লিকুইডেট করলে কলকারখানা অচল হবে। তেমনি ব্যাঙ্ক, সরকারী অফিস ও সেনাবিভাগ।

গায়ের জোরে কতকগুলি লোককে উৎখাত করা যায়। কিন্তু তারা যদি হয়ে থাকে দরকারী মানুষ তবে তাদের শূন্যতা পূরণ করবে কে? চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবও শূন্যতা পূরণ করতে না পেরে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। শূন্যস্থান তাঁরাই পূর্ণ করছেন যাঁরা কাজের লোক। কাজের লোককে কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক দিতেই হবে। অবশ্য তাঁরা যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করেন সেকথা আলাদা।

স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকারের জন্যে শত শত কর্মী এগিয়ে না এলে বিপ্লবী সমাজব্যবস্থাও মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হবে। সামাজিক বিপ্লবই শেষ কথা নয় চীনারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। সামাজিক সুবিচার বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে সাধারণ শ্রমিকদের মত সকলে জানে। তারা চায় সম্পূর্ণ সাম্য। কিন্তু সমাজে ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার প্রভৃতিরও প্রয়োজন

আছে। আছে বৈজ্ঞানিকদেরও প্রয়োজন। এঁরা চান পারিশ্রমিকের বৈষম্য। এঁদের কোতল করে বা খেদিয়ে দিয়ে যা হবে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার এঁদের পাওনা এঁদের দিলে যা হবে তাও সমসমাজ নয়।

এতক্ষণ আমি বিদেশের কথা আলোচনা করলুম। এখন করি স্বদেশের কথা। এদেশে কারিগর বলে একটা শ্রেণী আছে। কামার কুমোর রাজমিস্ত্রী ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে এই শ্রেণী। এরা দিন আনে দিন খায়। অপরে এদের পুরো পাওনার থেকে কম দেয়, কিন্তু এরা অপরকে শোষণ করে না। কী এদের অপরাধ? কেন এই শ্রেণীটিকে উচ্ছেদ করা হবে? কেন এদের কলকারাখানার মজুরে পরিণত করা হবে? কেন এদের কামারশাল বা কুমোরশাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে? এরা তো কাউকে খাটায় না, খাটিয়ে লাভ করে না। দক্ষতার নিরিখে কেউ হয়তো কিছু বেশী কামায়, কেউ কিছু কম। এটা কি পারিশ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে না? মুনাফার পর্যায়ে পড়ে?

তেমনি বিরাট একটি শ্রেণী আছে যারা নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করে। এরা জোতদার নয়, এক বিঘা দু'বিঘার মালিক। এদের মালিকানা কেড়ে নিয়ে এদের জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা কি শোষণের প্রতিকার? কার শোষণের প্রতিকার? এদের যদি বৃহৎ খামারের ক্ষেতমজুরে পরিণত করা হয় তা হলেই কি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে? দক্ষতা অনুসারে কেউ বেশী কেউ কম মজুরি পাবে না?

যে শ্রেণী শোষক তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে। তাকে বিদায় দিলে হয়তো সামাজিক অন্যায় বিদায় হবে। কিন্তু যে শ্রেণী শোষক নয় তাকে তার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করলে সেটা কি নতুন একটা অন্যায় হবে না? গায়ের জোরে এই নতুন অন্যায়টা যাঁরা করবেন তাঁরা কিছুকালের জন্যে সফল হতে পারেন, কিন্তু একদিন না একদিন তাঁদেরও জবাবদিহির কাল আসবে। ইতিহাস যে চিরকাল তাঁদেরি দিকে এটা একটা অন্ধবিশ্বাস। বিপ্লব কথাটার যাদুমন্ত্রে সবাই সব সময় ভুলবে না। ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে হয়তো বিপ্লব ছাড়া আর গতি নেই, কিন্তু যাদের অল্পস্বল্প ভূমি আছে আর সে ভূমি তারা নিজেরাই চাষ আবাদ করে বিপ্লব তাদের মালিকানা কেড়ে নিলে তারা তাকে স্বাগত জানাবে কি?

তেমনি ক্ষুদে দোকানদাররা। যারা নিজেরাই খাটে, অপরকে খাটায় না। লাভ যা করে তা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটায়। কাকেই বা এরা

শোষণ করে? এদের দোকান রাষ্ট্রায়ত্ত করে এদের দোকান কর্মচারীতে পরিণত করলে সাধারণেরই বা এমন কী সুবিধে? গায়ের জোর ছাড়া এর স্বপক্ষে আর কী যুক্তি আছে? যতক্ষণ না এদের অস্তিত্বটা অর্থনীতির দিক থেকে ক্ষতিকর হচ্ছে ততক্ষণ এদের গায়ে হাত দেওয়া উচিত নয়। দিলে সেটাও অন্যায়।

সমাজতন্ত্র কাকে বলে

সমাজতন্ত্র কথাটি আমাদের নয়। দেশান্তরিত ও ভাষান্তরিত হয়ে সোশিয়ালিজম এই শব্দরূপ নিয়েছে। সোশিয়ালিজম কথাটিও নতুন। তার প্রথম ব্যবহার নাকি ১৮৩২ সালে। তবে মতবাদটা আরো পুরোনো। ফরাসী বিপ্লবের শেষের দিকে বিপ্লবীরা কেউ কেউ ডেমোক্রাসী থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যেটা চায় সেটা একপ্রকার সোশিয়ালিজম। ফলে তাদের জোট ভেঙে যায়, জোর কমে যায়, বিপ্লবটাই ব্যর্থ হয়।

প্রাইভেট প্রপার্টিতে হস্তক্ষেপ না করে সোশিয়ালিজম হয় না। আর প্রাইভেট প্রপার্টিকে ডেমোক্রাটরাও যক্ষের ধনের মতো পাহারা দেয়। ভোটের জোরে বা জোটের জোরে মানুষের পারিবারিক বা স্বোপার্জিত সম্পত্তি কেড়ে নিলে মানুষমাত্রই ক্ষেপে যায়, যদি না উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায়। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে রাষ্ট্র দেউলে হয়। না দিলে বিরোধী পক্ষ দল পাকায়, ভোট ভাঙিয়ে নেয়, জোটে ভাঙন ধরায়। পরের বারের নির্বাচনে হয়তো বিরোধী পক্ষই জয়ী হয়। তখন কেড়ে নেওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বিলেতের লেবার পার্টি ভোটের জোরে ও জোটের জোরে ইস্পাত শিল্পের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়েছিল। কিন্তু পরের বার নির্বাচনে হেরে যায়। বিজেতা কনসারভেটিভ পার্টি সে মালিকানা রাষ্ট্রের হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে। ডিন্যাশনালাইজেশন ঘটে। লেবার পার্টি পরে আবার জেতে। কিন্তু ইস্পাতকে আর রাষ্ট্রসাৎ করে না। জনমতও আর সেটা চায় না। বিলেতে সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে মতভেদ এখন এমন তীব্র যে পার্লামেন্টারি উপায়ে ও জিনিস আদৌ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ইংলণ্ডের লোক বহু শতাব্দী ধরে ক্রিকেট খেলে আসছে। তাদের কাছে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীও একপ্রকার ক্রিকেট। ক্রিকেটে একপক্ষ ব্যাট ধরে, অপর পক্ষ বল করে। কিন্তু বরাবর নয়। পালা করে কেবলমাত্র একপক্ষই ব্যাট ধরবে ও অপরপক্ষ বল করবে এরকম যদি হয় তবে সেটা ক্রিকেট নয়। তেমনি একই পার্টি যদি প্রত্যেকবার নির্বাচনে জয়ী হয় ও সরকার গঠন করে তা হলে সেটাও পার্লামেন্টারি কনভেনশন নয়।

হতে পারে সেটা আইনসম্মত, কিন্তু রীতিবিরুদ্ধ। লেবার পার্টি নির্বাচনের পর নির্বাচন জিতবে, বিশ বছর বা বত্রিশ বছর ধরে রাষ্ট্র চালাবে, একের পর এক শিল্প রাষ্ট্রসাৎ করবে, দোকানগুলোকেও হাতে নেবে, কৃষির জমি ও বসতবাড়ীও ছাড় দেবে না, ইংলণ্ডের লোক এটা ভাবতেই পারে না। এটা ক্রিকেট নয়।

সেজন্যে লেবার পার্টির সুর আজকাল বেশ নরম হয়ে এসেছে। ওরা এখন মানতে আরম্ভ করেছে যে পাবলিক সেকটর ও প্রাইভেট সেকটর দুটো সেকটরই থাকবে। অর্থাৎ ধনতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র দুটোই সহ-অবস্থান করবে। ওরা এমন কয়েকটা কমাণ্ডিং হাইটস হাতে পেলেই সন্তুষ্ট। তার মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্চতম কয়েকটা শৃঙ্গ থাকবে রাষ্ট্রের অধিকারে ও আয়ত্তে। আর সব না থাকলেও চলে। একে সোশিয়ালিজম না বলে র‍্যাডিকালিজম বলা সংগত। পার্লামেণ্টারী সীস্টেম যদি বজায় রাখতে হয় তবে পাবলিক সেকটরের সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট সেকটরও বজায় রাখতে হয়। মাঝে মাঝে লেবার জিতবে, কিন্তু একটানা শাসন চালাতে পারবে না। ইংলণ্ডের লোক রাজী হবে না। বাড়াবাড়ি করলে পার্লামেণ্ট ভেঙে যাবে। ডেমোক্রাসী উঠে যাবে। তখন যেটা হবে সেটা পার্টি ডিকটেটরশিপ। লেবার ডিকটেটরশিপের চেয়ে কনসারভেটিভ ডিকটেটরশিপেরই আরো বেশী সম্ভাবনা। কারণ সিভিল ও মিলিটারী সার্ভিসগুলোর চূড়ায় বসে আছেন উচ্চতর শ্রেণীর সন্ততি। ওদের শ্রেণীবিন্যাস এমন যে উপরওয়ালা প্রায় সবক্ষেত্রে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ ইটন হ্যারো প্রভৃতির প্রাক্তন ছাত্র। ওসব প্রতিষ্ঠান বনেদী বংশের সন্তানের একচেটে না হলেও ধারাটা বনেদী।

বনেদী বংশের সন্তানকেও সোশিয়ালিস্ট হতে দেখা গেছে। কিন্তু সেটা হলো ব্যতিক্রম। সম্পত্তির প্রশ্নই যদি প্রবল হয় তবে ধনতন্ত্র ভেসে যাবার আগে গণতন্ত্রই ভেসে যায়। এটা অনুভব করে অধ্যাপক ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন, "ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা খেলার নিয়ম বদলে দিতেও পারেন।" তা শুনে কনসারভেটিভরা তো রেগে গেলেনই লেবারও ভয় পেয়ে গেল। লেবার নেতারা জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা গণতন্ত্র ভিন্ন আর কোনো খেলায় বিশ্বাস করেন না। খেলার নিয়মটা সব সময় মেনে চলবেন। ব্যালটই তাদের অস্ত্র। বুলেট নয়।

কিন্তু সোশিয়ালিজমের পরীক্ষা যতগুলি দেশে হয়েছে ব্যালট সহযোগে

কোথাও আমূল পরিবর্তন হয়নি। কেননা মানুষের সম্পত্তির টান সর্বত্র প্রবল। তাই পাবলিক সেকটর বাড়তে থাকলেও প্রাইভেট সেকটর লোপ পায়নি, যতদূর দৃষ্টি যায় সহ-অবস্থান করবে। তা হলে যারা আমূল পরিবর্তন অভিলাষী তারা করবে কী? ব্যালট ছেড়ে বুলেট বেছে নেবে? তা যদি করে তবে পার্লামেন্টারি সীস্টেমটাই ভেঙে পড়তে পারে। ডিকটেটরশিপ তার জায়গা জুড়তে পারে। সেটা যে শ্রমিক ডিকটেটরশিপ হবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। বিপরীতটাও হতে পারে। ফ্রান্সের ও ইটালীর কমিউনিস্টরাও এটা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরাও ব্যালটের দিকেই ঝুঁকেছেন।

কিন্তু ধনতন্ত্রও সাবধান হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের রক্ষণশীলরাও স্বীকার করেছেন যে কিছু রাখতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। সব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকলে সবকিছু হারানোর সম্ভাবনাও আছে। এটা তো জাজ্বল্যমান সত্য যে রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব সফল হয়েছে। যদিও তার দ্বারা প্রমাণ হয়নি যে, আমেরিকায় ও জাপানে বিপ্লব ঘটলে সফল হবে। আজকের দুনিয়ায় ধনিকদের দেশেও শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান রুশ চীনের তুলনায় উচ্চতর। তাই শ্রমিকরা চোখ বুজে বিপ্লবের জন্যে সর্বস্বপণ করতে উৎসাহ বোধ করছে না। তাদের দাবি আমূল পরিবর্তন নয়, আরো কম খাটুনি, আরো বেশী মজুরি, সকলের চাকরি,সকলের চিকিৎসা, সকলের ঘরবাড়ী, সকলের ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা। শ্রমিকদের প্রায় সকলেরই ব্যাঙ্কে টাকা জমেছে, সুদে খাটছে। কোম্পানীতে শেয়ার আছে, মুনাফা আসছে। কোম্পানীর ডাইরেকটর পদেও শ্রমিকদের নেওয়া হচ্ছে। লাভ লোকসানের হিসাবও তাদের দেখানো হচ্ছে।

সোশিয়ালিজম বলতে যদি বোঝায় সোশিয়াল সিকিউরিটি বা সামাজিক নিরাপত্তা তবে সে জিনিস ধনতন্ত্রী দেশগুলিতেও বহু পরিমাণে অর্জিত হয়েছে। বেকার সমস্যা আগেকার মতো ব্যাপক নয়। সাময়িকভাবে যারা বেকার হয় তারা বেকার ভাতা পায়। চাষীদেরও নানাভাবে সাহায্য করা হয়। তবে এখনো অনেক লোক বস্তিতে বাস করে। দারিদ্র্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বহুলোকের বেলা তা খাটে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যও বেশ প্রকট। সে বৈষম্য কবে দূর হবে কেমন করে দূর হবে কেউ বলতে পারছেন না। চীনদেশে ততটা বৈষম্য নেই রুশদেশে যতটা আছে। মোটের উপর সমাজতন্ত্রী দেশগুলি বৈষম্য থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত।

সেজন্য সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় সামাজিক সাম্য। সমাজতন্ত্রীদের বি[illegible]স

ধনবৈষম্য যদি দূর হয় আর সব বৈষম্যও সেই সঙ্গে দূর হবে। যার ধন বেশী তার প্রভাব বেশী এটা কি সাধারণতঃ দেখা যায় না? এর প্রতিকার রাষ্ট্রের মালিকানা। রাষ্ট্রই হবে সব সম্পদের মালিক। সোশিয়ালিজম বলতে বোঝাবে সোশিয়াল ওনারশিপ বা স্টেট ওনারশিপ। রাষ্ট্রই যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন দেবে। যার যেমন সামর্থ্য তার কাছ থেকে তেমন নেবে। বলা বাহুল্য, এতেও ঠিক সমতা রক্ষা হবে না। কারণ প্রয়োজন সকলের সমান নয়, সামর্থ্যও সকলের সমান নয়। তবে মোটের উপর কেউ বড়লোক হবে না, কেউ গরীব হবে না। কেউ ক্ষমতাভোগী হবে না। কেউ ক্ষমতাহীন হবে না, কেউ প্রভাবশূন্য হবে না। হলে হবে উনিশ বিশ।

এমনি করে সমাজ ও রাষ্ট্র একার্থক হয়ে উঠেছে। যেন রাষ্ট্রই সমাজ, সমাজই রাষ্ট্র। তাই যদি হয় তবে একে সোশিয়ালিজম না বলে স্টেট ক্যাপিটালিজম বলতে বাধা কোথায়? ক্যাপিটালিস্ট বলে একটা শ্রেণী থাকবে না। কিন্তু ক্যাপিটাল তো থাকবে। যার কর্তৃত্বে থাকবে সেই ক্যাপিটালিস্ট। তার মানে দেশের সরকার। সরকার তো দেশের কোটি কোটি লোক হতে পারবে না। নিছক ধনসাম্য উপভোগ করেই কি তারা সন্তুষ্ট হবে? তারাও চাইবে ক্ষমতার শরিক হতে, প্রভাবের শরিক হতে। রুশদেশে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে স্টালিনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ও তাঁদের অনুগামীরা পাইকারী-ভাবে নিপাত যান। চীনদেশে তো তাঁদের তাড়াবার জন্যে মারবার জন্যে আস্ত একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব উপরের দিক থেকে ঘটানো গেল। ধনসাম্যই সব নয়। মানুষ এমন এক জীব যে চায় সর্বপ্রকার সাম্য। সে চায় স্টালিনের সঙ্গে সমান হতে, মাওয়ের সঙ্গে সমান হতে। মুখে বলা হচ্ছে প্রোলিটা-রিয়ানদের ডিকটেটরশিপ। কিন্তু কাজের বেলা দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের ও তাঁর আস্থাভাজন আরো কয়েকজন ব্যক্তির ডিকটেটরশিপ। ডিকটেটরশিপটা প্রোলিটারিয়ানদের দ্বারা নয়, উপরে। সে বেচারিরা টুঁ শব্দটি করতে পারবে না।

সাম্য একপ্রকার হয়েছে, কিন্তু বৈষম্য উপর থেকে তল অবধি প্রত্যেকটি স্তরে। মার্কস বোধ হয় ভাবতেই পারেননি যে, একদল ধনতন্ত্রীকে সরিয়ে তাদের জায়গায় একদল বলতন্ত্রীকে বসানো হবে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সোশিয়ালিস্ট সংস্করণ। পশ্চিম ইউরোপের লোক এখনো ইনকুইজিশনের বিভীষিকা ভুলে যায়নি। কত লক্ষ জ্যান্ত মানুষকে যে পোড়ানো হয় তার

সংখ্যা নেই। সেটা ছিল পরলোকে স্যালভেশনের জন্যে। এটা হচ্ছে ইহলোকে সাম্যের জন্যে। পশ্চিম ইউরোপ তাই আর ও জিনিস চায় না। মার্কস বেঁচে থাকলে তিনিও কি চাইতেন? বোধ হয় লেনিন বেঁচে থাকলে তিনিও না। কারণ তিনি পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহ্য এঁদের ধর্মান্ধ হতে দিত না। সেটা স্টালিনের পক্ষেই সম্ভব। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের তিনি ধার ধারতেন না। মাও সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কমিউনিজম এঁদের কাছে নতুন এক ধর্ম।

রাষ্ট্রকে চার্চের মর্যাদা দিয়ে সমাজের সর্বসাধারণের জান মাল তার হাতে সঁপে দেওয়া বাকুনিনের পক্ষে ভয়াবহ ছিল। মার্কসের সঙ্গে তাঁর পথভেদ হয়। তেমনি আরও অনেক সমাজবিপ্লবীর। এঁরা কেউ অ্যানারকিস্ট, কেউ ফেবিয়ান সোশিয়ালিস্ট। গত শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে বাস করবার সময় গান্ধীজীও বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। রাষ্ট্রের জন্যে সমাজকে খাটো করা হবে না, সমাজের জন্য ব্যক্তিকে খাটো করা হবে না, এই যে চিন্তাধারা এতেই তিনি অভিষিক্ত।

সামাজিক সাম্য যদিও সমাজতন্ত্রবাদীদের সকলের কাম্য তবু অনেকেই এতে রাজী নন যে, রাষ্ট্রই হবে সকলের সব সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী। নিজের বলতে কারো কিছু থাকবে না, কেবল রাষ্ট্র যেটুকু দেবে সেইটুকু, রাষ্ট্রের উপর এতখানি নির্ভরতার মূলে তো আছে রাষ্ট্রের সুবিচারের উপর পরম বিশ্বাস। কিন্তু রাষ্ট্র যদি অবিচার করে, পক্ষপাতিত্ব করে? রাষ্ট্র তো মানুষের দ্বারাই পরিচালিত। মানুষ কি সব সময় অভ্রান্ত? সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদীদের নানা মুনির নানা মত। শোনা যায় বাকুনিন তো রাষ্ট্রের পাটই রাখতে চান না। তিনি চান রাষ্ট্রশূন্য সমাজ। ততদূর যেতে যাঁরা রাজী নন তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁদের কেউ হন সিণ্ডিকালিস্ট, কেউ ফেবিয়ান সোশিয়ালিস্ট। সিণ্ডিকালিস্টরা পার্লামেন্টের ধার ধারেন না, ফেবিয়ানরা ধারেন। তবে পার্লামেণ্টকেও তাঁদের ইচ্ছামতো বদলাতে চান। যাতে সেটা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এমনি আরো অনেকরকম সোশিয়ালিস্ট থিয়োরি আসর সরগরম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় রাষ্ট্র বাদ দিয়ে ভাবতে পারা যায় না। পার্লামেণ্ট বাদ দিয়ে ভাবলে পশ্চিম ইউরোপে পাত্তা পাওয়া যায় না। পার্লামেণ্ট নামটা অবশ্য সবাই ব্যবহার করেন না। সংবিধানও একই নয়। তবু জনসাধারণের নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের একটি প্রতিষ্ঠান চাই। সেটি হচ্ছে লেজিসলেচার। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি অঙ্গ। আর দুটি হলো একজিকিউটিভ ও জুডিসিয়ারি। একজিকিউটিভ হবে লেজিসলেচারের কাছে দায়ী। আর লেজিসলেচার হবে ইলেকটোরেটের কাছে দায়ী। এরই নাম ডেমোক্রাসী। এর সঙ্গে সোশিয়ালিজম যোগ করলে যোগফল হয় সোশিয়াল ডেমোক্রাসী।

পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গেই আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক সবচেয়ে পুরাতন ও নিবিড়। আমাদের নেতারা পার্লামেণ্ট ভিন্ন চিন্তা করতে অভ্যস্ত নন। এর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী। তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' গ্রন্থখানি এমন এক মতবাদের বার্তা দেয় যা অহিংস হলেও রাষ্ট্রশূন্য ও পার্লামেণ্টশূন্য সমাজের পক্ষপাতী। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সমাজ রচনার কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। পার্লামেণ্টকেও তিনি আমল দিতেন না। কিন্তু যতই দিন যায় ততই দেখা যায় ভারতের রাজনীতি-সচেতন সম্প্রদায় রাষ্ট্রও চান, পার্লামেণ্টও চান। সেসব অবিকল ইংলণ্ডের মতো। গান্ধীজীও তাঁদের নেতা হতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু তাঁর অভীষ্ট ছিল পঞ্চায়তী শাসন ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সবচেয়ে কম, পার্লামেণ্টের সভ্যরা হবেন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস এর কোনোটাই মানে না। তেমনি তাঁর সমাজব্যবস্থাও ছিল শিল্পবিপ্লবকে বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রীকৃত। যেমন ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হবে না তেমনি ধনসম্পদও কেন্দ্রীভূত হবে না। ধনিক যদি থাকেন তো তিনি হবেন ন্যাসী। কংগ্রেস ওসব শোনে না। আর বামপন্থীরা চান সোশিয়াল ডেমোক্রাসী।

গান্ধীজীর সমাজব্যবস্থাকে বলা হয় ইউটোপিয়ান সোশিয়ালিজম। কারণ উৎপাদন পদ্ধতি অতীব সরল। গত কয়েক শতাব্দীতে উৎপাদনপদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমরা যা দেখি তা যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাস প্রোডাকশন। সে-সব যন্ত্রপাতিও বাষ্প বা বিদ্যুৎচালিত। পারমাণবিক শক্তি যখন কলকারখানায় পৌঁছবে তখন মাস প্রোডাকশন বহুগুণিত হবে। তাতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়বে ও বাড়তি সমৃদ্ধির অংশ শ্রমিকরাও পাবে। গ্রাম্য শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নত হবে। তার ফলে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না তো? হয়তো পাবে, কিন্তু বেকার ভাতাও বৃদ্ধি পাবে। ধনতন্ত্রীরাও চায় যে বেকারদের হাতে টাকা আসুক, ওরা সে টাকা দিয়ে ভোগ্যপণ্য কিনুক। ওরা যা খরচ করবে সেটাও তো ধনতন্ত্রকেই সচল রাখবে। একজন বিশিষ্ট

অর্থনীতিবিদ্ তো লিখেছেন, বেকারদেরও মজুরির সমান ভাতা দিতে হবে। কাজ করুক আর না করুক ওরা সমান রোজগার করবে, সমান খরচ করবে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট আবার ঘনিযে না এলে ধনতন্ত্রের শিক্ষা হবে না। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে সেটা বার বার আসবেই। গান্ধীও তার ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হননি। জানতেন যে গোড়ায় গলদ আছে। সেটা একদিন ধরা পড়ে যাবেই। তবে এই দুই মুনির মধ্যে গভীর মতভেদ ছিল। একজন বিশ্বাস করতেন উৎপাদন পদ্ধতির সরলতায়, অপরজন জটিলতায়। একজন বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনে, অপরজন সেই পর্যন্ত উদ্ভাবনে যা কুটীরশিল্পের ক্ষতি না করে। মার্কস শহুরে মানুষ, শহরকেই সভ্যতার আধার ভাবতেন, গ্রামের দিকে তাকাতেন না। নাগরিক সভ্যতার কোলে লালিত, কৃষির দিকে তাকাতেন না। গান্ধী তার বিপরীত। নাগরিক সভ্যতার অন্ধকার দিকটা তিনি এত বেশী করে দেখেছিলেন আর গ্রাম্য সভ্যতার আলোকিত দিকটা যে, তিনি ছিলেন কৃষি ও কারুশিল্পের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী। প্রকৃতি যেসব খনিজ সম্পদ মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে সেসব কি মানুষের ভোগে লাগবে না? এর উত্তর আর পাঁচ জন আধুনিক মানুষ যেভাবে দেন মার্কস্ও সেইভাবে দিতেন। কিন্তু গান্ধীর উত্তরটা মধ্যযুগের সাধুদের মতো। ভোগসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ। স্বাচ্ছন্দ্যের মান নয়, নৈতিক মানটাই হবে উচ্চ।

গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, ঘরে ঘরে ছড়ানো উৎপাদনের নাম মাস প্রোডাকশন নয়। গান্ধী তাকে বলতেন মাস কর্তৃক প্রোডাকশন। বেকার বসে থেকেও একজন মজুরির সমান ভাতা পাবে তিনি এ প্রস্তাব শুনলে কানে আঙুল দিতেন। অলস মানুষ যে অমানুষ। অলস মস্তিষ্ক যে শয়তানের কারখানা। সমাজ ভরে যাবে অপরাধে ও পাপে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেদিনকার রুটি সেদিন রোজগার করতে হবে, এই ছিল তাঁর নীতি। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি সমানে চরকা কেটে গেছেন। এর নাম ব্রেড লেবার। ধনিকদেরও এর থেকে অব্যাহতি নেই। দিনের খানিকটে সময় কায়িক শ্রমে নিয়োগ করতেই হবে।

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে প্রকৃতি তার খনিজ সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। মানুষ সেই গুপ্তধন একটি যুগেই নিকাশ করে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই টান পড়তে আরম্ভ করেছে। ইংলণ্ডে এখন পেট্রোল রেশন করা হচ্ছে। কলকাতায় বিদ্যুতের

অনটন, গ্যাসের অনটন, কয়লারও অনটন। শুধুমাত্র জাতীয়করণ হলেই কি এসব পদার্থ অফুরন্ত হবে? সোভিয়েট রাশিয়া যদি সাইবেরিয়ার গুপ্তধন উদ্ধার না করে তবে তারও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে টান পড়বে। পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভে যা নিহিত রয়েছে তার জন্যেও একদিন সমুদ্রমন্থন হবে। কাড়াকাড়ি করবে ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দেবাসুর। হিমালয়ের তলায় কে জানে কী সম্পদ অদৃশ্য রয়েছে। তা নিয়ে মারামারি করবে ভারত ও চীন। মহাশূন্য পার হয়ে চন্দ্রলোকে গিয়ে ধনরত্নের অন্বেষণও বিচিত্র নয়। চন্দ্রলোকও ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে।

শোনা যাচ্ছে নিমগ্ন মহাদেশ আটলানটিসের সন্ধান পাওয়া গেছে স্পেনের পশ্চিমে। খবরটা যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ একদা সভ্যতার শীর্ষে উপনীত হয়েছিল, কিন্তু পারল না সেখানে তিষ্ঠতে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হলো। বর্তমান সভ্যতাও যে একদিন অতীতের কাহিনী হবে না কে বলতে পারে সে কথা? ঐশ্বর্যই সব নয়। মানবজীবনের আরো কিছু অন্বিষ্ট আছে। ম্যাটার সেই পর্যন্ত ভালো যে পর্যন্ত তা স্পিরিটকে সাহায্য করে। তাকে অবহেলা করাও ঠিক নয়, মাথায় করে নাচাও ঠিক নয়। ধনিকদের এই পরিমাণ তেজ কোন কালেই ছিল না। তাদের নিপাত করে তাদের স্থান নিলেই কি সর্বসাধারণের তেজ বেড়ে যাবে? না মুষ্টিমেয় দলপতি ও কর্মকর্তার তেজ? স্বাচ্ছন্দ্যের মান হয়তো কিছু বাড়বে, কিন্তু জীবনের জটিলতাও তো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। সবাইকে মোটর গাড়ী জোগাতে গিয়ে এমন হয়েছে যে, লণ্ডন নিউ ইয়র্কের রাস্তাগুলোতে জ্যাম। পায়ে হাঁটাই সুবিধের। গাড়ী পার্ক করার জায়গা নেই, গাড়ী ফিরে যায় বিশ মাইল দূরে বাড়ীতে। কিংবা উপরে তোলা হয়। কিংবা মাটির তলায় নামে। প্যারিসে দেখলুম রাস্তার এপার থেকে ওপারে যেতে হলে মাইল দশেক ঘুরে যেতে হয়। পেট্রোলের শ্রাদ্ধ। একজন বই লিখছেন, মোটরগাড়ী বিলোপ করো।

আমরা পড়ে গেছি তেটানায়। ধনতন্ত্রের কুহক এদেশেও প্রতিদিন আমাদের মুগ্ধ করে। দোকানগুলো ধনতন্ত্রের ফসলে ভরা। টেরিলিনের ট্রাউজার্স পরে সাহেব না সাজছে কে! বাড়ীর চাকরেরও সে সাজ চাই। আবার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আকর্ষণও কম নয়। সে নাকি সবাইকে আলাদীনের প্রদীপ এনে দেবে। পাবলিক সেকটর বানাও, কাজে ঢিলে দাও,

উৎপাদন আপনা আপনি বাড়বে আর বণ্টন ফাঁপা টাকা দিয়ে হবে। বাকি থাকে গান্ধীজীর ইউটোপিয়ান সমাজনীতি, যাকে সমাজতন্ত্র বলাই কঠিন। নিছক উৎপাদনের দিক থেকে বিবেচনা করলে ক্যাপিটালিস্ট প্রোডাকশন ও সোশিয়ালিস্ট প্রোডাকশন কোনোটাই কোনোটার তুলনায় কম সফল নয়। সোভিয়েট রাশিয়া মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে। এখনও কিছু পেছিয়ে আছে, কিন্তু বরাবর পেছিয়ে থাকবে না। তেমনি ক্ষুদ্রকায় জাপান অতিকায় রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে। কারো কারো মতে ইতিপূর্বেই ছাড়িয়ে গেছে। কী করে এই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হলো! হয়তো এইজন্যেই যে জাপানকে সামরিক খাতে অর্থব্যয় করতে হয়নি। যেমন সোভিয়েটকে করতে হয়েছে। পশ্চিম জার্মানী সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। জাপান যদি আবার রণসজ্জা না করে তবে তার অর্থ নৈতিক বিকাশ ব্যাহত হবে বলে মনে হয় না।

গান্ধীজীর উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো অপরীক্ষিত। তার মূলকথা হলো: দেশে যতগুলো হাত আছে সব ক'টাই শক্তির আধার। অশ্বশক্তির মতো মনুষ্যশক্তি। সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করলে উৎপাদন তো বাড়বেই, সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনও হয়ে যাবে। বণ্টনই তো ক্যাপিটালিজমের দুর্বল অঙ্গ। সেইজন্যেই তো সোশিয়ালিজমের এত বল। উৎপাদনের দিক থেকে গান্ধীজীর ব্যবস্থা পাল্লা দিতে না পারলেও বণ্টনের দিক থেকে দেবে। আর সেটা কেবল ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে নয়। সোশিয়ালিজমের সঙ্গেও। কারণ সোশিয়ালিস্টরাও উৎপাদন করে যেখানে বণ্টন করে না সেখানে। কাঁচামাল বয়ে আনতে ও তৈরি মাল বয়ে নিয়ে যেতে যে খরচটা হয় সেটা বাঁচানো যায় গান্ধীজীর ব্যবস্থায়। ধরো, ভারত যদি সোশিয়ালিস্ট হয় ও তার কাপড়ের উৎপাদন যদি আহমেদাবাদে হয় তবে আসামে সে কাপড় বয়ে নিয়ে যেতে যে খরচাটা হবে সেটা সোশিয়ালিজমের কল্যাণে কমবে না।

তাছাড়া গান্ধীজীর মতে যে উৎপাদন করবে সেই ভোগ করবে ও যে ভোগ করবে সেই উৎপাদন করবে। ব্যক্তির বেলা এটা সম্ভব না হলেও গ্রামের বেলা হবে, গ্রামের বেলা না হলেও জেলার বেলা হবে, জেলার বেলা না হলেও রাজ্যের বেলা হবে। এতে বণ্টনের সুরাহা হবে। কারো ভাগে হয়তো কম পড়বে, কারো ভাগে বেশী, সেটা পুষিয়ে দেবে গ্রামবাসী সমবায় বা জেলাবাসী সমবায় বা রাজ্যবাসী সমবায়। রাষ্ট্রকে কথায় কথায় এর মধ্যে টানতে হবে না। যা

করার তা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে থেকেও করা সম্ভব হবে। লোভরিপুকে সংযত করলে বিলাসবাসনাকে খর্ব করলে নিজেদের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলো নিজেরাই মেটাতে পারবে। গাড়ীঘোড়া সকলে চড়বে না, কিন্তু দুধ-ভাত সকলে খেতে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের মান খুব উঁচু না হোক খুব নিচুও হবে না। সাম্য মোটের উপর রক্ষিত হবে। ধনীরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করবেন। সম্পত্তির স্রাসী হবেন।

আমরা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী বেছে নিয়েছি। আমাদের দেশের ভোটারদের তিন চতুর্থাংশ বাস করে গ্রামে। বিনা ক্ষতিপূরণে তাদের জমি ও কুটীরশিল্প রাষ্ট্রসাৎ করতে পারা যাবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে যদি ফাঁপা টাকা আরো ফাঁপা হয় তাহলে ভোগ্যপণ্য ও ভোজ্য বস্তু অগ্নিমূল্য হবে। এখন তার নমুনা দেখছি, এর পর যা দেখব তা হিটলার-পূর্ব জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। হিটলারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলে হিটলারও আবার জন্মাবেন। হিটলারের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে স্টালিনও কি জন্মাবেন না আবার? সোশিয়াল ডেমোক্রাসী জার্মানীতেও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তবু শেষরক্ষা করতে পারল না। অর্থনৈতিক মন্দায় দেখতে দেখতে ষাট লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়। বেকার ভাতা দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখাও দুষ্কর হয়। সোশিয়াল ডেমোক্রাসী ফেল করে যায়। তাই তাকে নির্বাচনে হারিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তা সত্ত্বেও নাৎসীরা দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করতে পারেনি। দুই-তৃতীয়াংশ না হলে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়ে নিয়ে হিটলার জার্মানীর লোকসভায় বিরোধী পক্ষের সভ্যদের এই বলে শাসান যে, তাঁকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেতে না দিলে তিনি তাঁদের দেশদ্রোহী বলে গ্রেপ্তার করবেন। গ্রেপ্তারের ভয়ে অনেকেই সভার অধিবেশনে যোগ দেন না। যোগ দিলেও ভোটদানে বিরত থাকেন। হিটলার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন করে সেই অর্ডিনান্সটাকেই আইনে পরিণত করেন। এরপরে আর লোকসভার অধিবেশনই ডাকেন না। বারো বছর ধরে আর নির্বাচনই হয় না। সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা আর ফিরে আসার সুযোগই পান না।

এর থেকে শিক্ষণীয় এই যে, ভারতের সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দা সমস্ত শক্তি দিয়ে পরিহার করতে হবে। নয়তো তাঁরা শেষরক্ষা করতে পারবে না। তাঁদের সাধের দুই-তৃতীয়াংশ

তাঁদের কাজে না লেগে ফাসিস্টদের কাজে লাগবে। সম্পত্তি রক্ষার জন্তে ফাসিস্ট এ দেশেও গজাবে। সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের ব্যর্থতার স্থযোগ নেবে। এক্ষেত্রে লেশমাত্র মোহ পোষণ করা উচিত নয়। সম্পত্তির জন্তে মানুষ কী না করতে পারে? আদালতগুলোর প্রধান বিচার্য বিষয় তো সম্পত্তিঘটিত দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা। সম্পত্তি নিয়ে লোকে আদলতে লড়ে। আদালতে না পারলে তার বাইরে লড়বে। সুপ্রীম কোর্টে স্থবিচার পাওয়া যাবে না এ রকম ধারণা যদি ছড়ায় তাহলে লোকে স্থপ্রীম কোর্টের দিকে তাকাবে না। সম্পত্তি রক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করবে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর সাহায্যে সোশিয়াল ডেমোক্রাসী প্রবর্তন যাঁরা করতে চান তাঁরা যেন সব দিক ভেবে কাজ করেন। নয়তো আজকের সাফল্য কালকের ব্যর্থতা।

আমার মনে হয়, সাম্যের উপরে অত বেশী জোর না দিয়ে দেওয়া উচিত ন্যায়ের উপর। সামাজিক ন্যায়ই হবে সমাজতন্ত্রের অন্তঃসার। সোশিয়াল জাসটিসের জন্তে আদিকাল থেকেই মানুষের অন্তরে আছে একটা চাপা কান্না। সেটা কি কেবল শ্রমিক শ্রেণীর বা কৃষক শ্রেণীর? হাড়ি ডোম মুচি মেথরেরও নয়? সেটা কি নয় কারুশিল্পীদেরও? সেটা কি নয় বুদ্ধিজীবীদেরও? তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের ধ্যান, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের সত্তাকে কেই-বা আদর করে নিচ্ছে? কেই-বা উচিত মূল্য দিচ্ছে? তাঁদের তুলনায় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা আরো বেশী। শ্রমিকদের পেছনে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন। ধর্মঘট করে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। কিন্তু শিক্ষক বেচারাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। মিছিল করে এরা অরণ্যে রোদন করে। চাষীরাও আজকাল বেশ দর পায়। কবিরা কী পায়? সমাজকে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করাটাও আমার মতে উচিত নয়। ওতে বিত্তকেই অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয়। ধনতন্ত্রীদের মূল্যবোধকে স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি পাবে কোথায়? সমাজতন্ত্রীরা যদি সেই একই মূল্যবোধ মেনে নেন তবে ওলটপালটের পরেও দেখা যাবে বিত্তই মানুষের অভিষ্ট, বিত্তই মানুষকে সার্থক করে। বিত্তের বাইরে কি আর কোনো মূল্য নেই?

প্রাইভেট ক্যাপিটাল ভালো নয়, পাবলিক ক্যাপিটাল ভালো, মানবজীবনের ভালো-মন্দকে কি এভাবে ভাগ করা যায়? মানুষের নীতিবোধ

কি এতে তৃপ্ত হবে? অথচ প্রাইভেট ক্যাপিটালকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে যেসব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে পড়ে যাবতীয় অপরাধ। খুন-খারাবি, নারীধর্ষণ, লুঠ, ঘরজ্বালানো, জাল জুয়াচুরি। এক একটা বিপ্লবের ইতিহাস যেন নীতিবিপর্যয়ের ইতিহাস। এসব অপরাধ না হলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাই যদি হয় তবে চরম নৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে। বিপ্লবের পিঠ পিঠ আসবে যুদ্ধ। তার মানে আরো খুন-খারাবি, আরো নারীধর্ষণ, আরো ঘরজ্বালানো ইত্যাদি। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা বিপ্লবের কতটুকুই বা দেখে! যুদ্ধেরই বা কতটুকু? তাদের চোখে সবটাই এ্যাডভেঞ্চার বা সবটাই নাটক। এর ভিতর দিয়ে যারা গেছে তারাই জানে যুদ্ধ বা বিপ্লব কী জিনিস।

তবে এটাও ঠিক যে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যদি জনগণকে রুটি দিতে না পারে, ভূমি দিতে না পারে, শান্তি দিতে না পারে তবে এই যে তিনটি প্রচণ্ড ক্ষুধা এই তিনটি মিলে দারুণ বিপর্যয় ঘটাবে। সে বিপর্যয়ে পুরাতন শৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ধর্ম আর নীতি, সভ্যতা আর সংস্কৃতি বলতে এতকাল আমরা যা বুঝেছি তার বারো আনাই যাবে হারিয়ে। কে জানে, তাই হয়তো আছে কপালে।

আমার নিজের মত এই যে, সমাজকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা উচিত নয়। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজই জ্যেষ্ঠ। রাষ্ট্র যখন ছিল না সমাজ ছিল। রাষ্ট্র যখন দুর্বল ছিল সমাজ প্রবল ছিল। সমাজ যদি ইচ্ছা করে সামাজিক দণ্ড দিয়েও দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে পারে। সমাজ যদি ইচ্ছা করে কালোবাজারীদের মজুতদারদের ভেজাল কারবারীদের শাসন করতে পারে। সমাজ যদি ইচ্ছা করে মহাজন ও মুনাফাখোরদেরও সংযত করতে পারে। সমাজ যদি ইচ্ছা করে বেকারদের কাজে লাগিয়ে দিতেও পারে। অবশ্য এসবের জন্যেও চাই সংগঠন। সংগঠন আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। রাতারাতি আবির্ভূত হয় না। ডিসিপ্লিন বিনা টেকে না। নেতৃত্ব বিনা চলে না। অহিংসা বিনা অথরিটি অর্জন করে না। অথরিটি বিনা সিদ্ধিলাভ করে না।

সংগঠনের অভাব নেই দেশে। কিন্তু অথরিটি কোথায়? ব্রিটিশ সরকার যখন ছিল পালটা একটা অথরিটিও ছিল। সেটা গান্ধীজী পরিচালিত সংগঠনের। এখন সে সরকারও নেই, সে পাল্টা অথরিটিও নেই। পাল্টা অথরিটির শূন্যতা পূরণ করার তেমন কোন উদ্যোগও নেই। অগত্যা সকলের

দৃষ্টি বর্তমান সরকারের উপরেই। সরকারের কাছেই লোকে প্রত্যাশা করছে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রতিকার। সুব্যবস্থার নিদর্শন। হতাশ হলে তারা বিকল্প সরকারের উপর বরাত দেবে। কিন্তু এদেশে বিকল্প সরকার গঠন করার জন্যে পার্টি নেই। সবই খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। ভগ্নাংশ জুড়ে জুড়ে একটা গোটা পার্টি গড়া যায় না। যেতে পারত যদি মূলনীতিগুলো পরস্পরবিরোধী না হতো। ক্রিকেট এ দেশের খেলা নয়। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ভিতটা কাঁচা রয়ে গেছে। কংগ্রেস যদি ভেঙে যায় তবে কোয়ালিশন সরকার ভিন্ন গতি নেই। আর কোয়ালিশন যদি বিভিন্ন মতের গোঁজামিল হয় তবে সমাজতন্ত্রেরও চেহারা হবে জগাখিচুড়ির মতো।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যদি জনগণকে রুটি দিতে না পারে, ভূমি দিতে না পারে, শান্তি দিতে না পারে তাহলে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের দিকেই মানুষের মন যাবে। আমাদের আশে পাশেই রুশ চীন। তাদের দৃষ্টান্ত সমস্তক্ষণ আমাদের মনের উপর কাজ করছে। দেশটাও সেই রকম একটা দেশ। বৃহৎ, জনবহুল, অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ, কায়েমী স্বার্থ কণ্টকিত। একে ইংলণ্ড বা সুইডেন বানানোর চেয়ে রুশ বা চীন বানানো আরো স্বাভাবিক। বেশী নয়, কোটিখানেক লোককে মারতে ও মরতে হবে। আমাদের তরুণরা এখন এই মর্মেই চিন্তা করছে। ভবিষ্যৎ তো ওদেরই হাতে। আমরা বেঁচে থাকলে তো ওদের নিবৃত্ত করব। ওদের নিবৃত্ত করবে নরহত্যায় অপ্রবৃত্তি। যার অপর নাম অহিংসা।

ওরা আর আমরা

আমরা কথায় কথায় রাশিয়ার সঙ্গে, চীনের সঙ্গে, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের তুলনা করি। আকারে আয়তনে লোকসংখ্যায় আমরাও তো সমান সমান। আর সভ্যতার দিক থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ নই তো জ্যেষ্ঠ। সংস্কৃতির দিক থেকে আমাদের মতো প্রাচীন যারা তারা একে একে তাদের ধারাবাহিকতা হারিয়েছে, আমরাই আমাদের প্রাচীন ধারার সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে এসেছি। পৃথিবীতে যদি চারটি মহাশক্তি থাকে তো ভারত তাদের একটি।

আমরা ভুলে যাই যে রাশিয়া কোনকালেই পরাধীন ছিল না। স্বৈরাচারী স্বদেশী সম্রাটের অধীনতা পরাধীনতা নয়। পরাধীনতার ফলে যে চরিত্রহানি ঘটে রাশিয়ানদের বেলা তা ঘটেনি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তারা বার বার অকাতরে প্রাণ দান করেছে। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। হঠাৎ কমিউনিস্ট বনে গিয়ে তাদের চরিত্রের উন্নতি হলো তা নয়। টলস্টয় যাদের নিয়ে তাঁর অমর মহা-উপন্যাস 'সমর ও শান্তি' লিখে গেছেন তারা জাতিতে রাশিয়ান, ধর্মে খ্রীস্টান, কিন্তু মতবাদে কমিউনিস্ট নয়। আমরা কেউ হাজার চেষ্টা করলেও তেমন একখানা মহা-উপন্যাস লিখতে পারব না, কারণ পরাধীনতা আমাদের অধঃপতন ঘটিয়েছিল। আবার সেই পরাধীনতাও ছিল অধঃপতনের পরিণাম। আমাদের গর্ব করবার মতো যদি কিছু ঘটে থাকে তো সেটা ইংরেজের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাতেই বা আমরা কয় কোটি বা কয় লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি?

তেমনি চীন কোনকালেই কেন্দ্রচ্যুত ছিল না। অন্তত দু'হাজার বছর ধরে সে তার কেন্দ্রীয় শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা প্রদেশ ছিটকে পড়েছে। কিন্তু চীন মোটের উপর ঐক্যবদ্ধ। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও চীনদেশের দস্তুর নয়। প্রাকৃতিক চীনের বাইরে অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চল ছিল সাম্রাজ্যের অঙ্গ, স্বরাজ্যের অঙ্গ নয়। তারাই ছিল স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। এখন তো তারাও অনধিকারী। ভারতও মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় শাসনের আয়ত্তে এসেছে। মৌর্যযুগে, মুঘলযুগে,

ব্রিটিশযুগে, বর্তমান যুগে। কিন্তু চীনের মতো কেন্দ্রানুবর্তিতা ভারতের ইতিহাসে বিরল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও মাদ্রাজ ও বম্বেকে বহুপরিমাণে কলকাতার কর্তৃত্বের বাইরে রেখেছিল। মহারাণীর আমলেও দেশীয় রাজন্যরা বহু পরিমাণে নিরঙ্কুশ ছিলেন। বিভক্ত ভারত কোনমতেই চীনের মতো ঐক্য দাবী করতে পারে না। চীন তো ইতিমধ্যে আরো একাকার হয়েছে।

আমেরিকার উপনিবেশগুলি এককালে লণ্ডন থেকে শাসিত হলেও পরাধীন কোনদিন ছিল না। শাসক ও শাসিত একই জাতি। তাদের একই ভাষা, একই ধর্ম, একই ইতিহাস। তা হলেও তাদের আদর্শ ছিল ভিন্ন, স্বার্থও ছিল ভিন্ন। তাই তারা পৃথক হয়ে যায়, পৃথক নীতি অনুসরণ করে, পৃথকভাবে বিকশিত হয়। তাদের জাতীয় মানসে পরাধীনতার গ্লানি নেই। পরাধীনতার ফলে চরিত্রহানিও ঘটেনি। স্বাধীনতার পর থেকে তার ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দাস-প্রথার প্রশ্নে যখন রাষ্ট্র দু'ভাগ হযে যায় তখন ঐক্য ফিরিযে আনার জন্যে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিযে যেতে হয়। যে দেশের মোট জনসংখ্যা মাত্র তিন কোটি সে দেশ চার বছর লড়াই করে দশ লক্ষ প্রাণ বলি দেয। জখম হয় পঞ্চাশ লাখ। ঐক্য রক্ষার জন্যে এত দাম আমরা কি কোনো কালে দিযেছি? গৃহযুদ্ধের সূচনাতেই তো আমরা দেশ ভাগে রাজী হযে গেলুম। ভারতের বারো আনা অংশকে ভারত বলে চালাচ্ছি, তা বলে কি এটা প্রাকৃতিক ভারত?

তা হলেও আমাদের গর্ব করবার মতো অনেক কিছু আছে যা আর কারো নেই। এতগুলো ভাষা নিযে সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলতে পারে, গণতান্ত্রিক শাসন চলতে পারে কি? ইংরেজরা বলত আমরা পারব না। আমরা দেখিযে দিয়েছি যে আমরা পারি। এতগুলো ধর্ম নিয়ে বৈদেশিক শাসন চলতে পারে, স্বাদেশিক শাসন চলতে পারে কি? ইংরেজরা বলত আমরা পারব না। ভেদবুদ্ধির বীজ বুনে গেল। আমরাও তার জন্য দায়ী। স্বাধীনতার পরে স্বেচ্ছায আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার পণ নিয়েছি, ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও পণরক্ষা করেছি। ভারত কেবল হিন্দুদের একার নয়, মুসলিম, শিখ, খ্রীস্টান, পার্শী, জৈন, বৌদ্ধ, নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীদের। কমিউনিস্টরা ঈশ্বর মানেন না, ধর্ম মানেন না বলে অনধিকারী নন। আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হযেছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, পুলিসের ভার পেয়েছেন। এই পরিমাণে সহনশীল মার্কিনরা তো নয়ই, ফরাসীরাও নয়। আজকাল প্রায় সব দেশেই পাবলিক সেকটর ও প্রাইভেট

সেকটর নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। ভারতেও চলেছে। পঁচিশ বছরে এ দেশ পুরোপুরি সমাজতন্ত্রী হয়নি বলে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি? তাড়াতাড়ি করতে গেলে বাড়াবাড়ি হতো। গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। তা ছাড়া পাবলিক সেকটর চালাবার মতো অভিজ্ঞতাই বা ক'জনের ছিল? অর্থনীতি অতি জটিল শাস্ত্র। শাস্ত্র যাঁরা পড়েছেন তাঁরা হাতে কলমে কাজ করেন নি। পুঁথি পড়ে যেমন ধান ক্ষেতে ধান ফলানো যায় না তেমনি পাবলিক সেকটরে উৎপাদন দেখানো যায় না।

শত চেষ্টা করলেও আমরা চীনের মতো বা রাশিয়ার মতো বা আমেরিকার মতো হতে পারব না। হওয়া সম্ভবও নয়। পরের মতো হতে যাবই বা কেন? যে যার নিজের বৈশিষ্ট্যের মূল রহস্যটি জেনে নিয়ে সেই অনুসারে বিকশিত হবে। ব্যক্তির বেলা যে নিয়ম দেশের বেলাও তাই। তেমনি এ কথাও সত্য যে আধুনিক যুগে কোনো দেশই তার ষোল আনা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারছে না। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। জাপান যে পথ ধরেছে সেটা দেখলে মনে হবে অনুকরণের পথ। সবাই বলে জাপান একটি পাশ্চাত্য দেশ। সত্যি কি তাই? আসলে জাপান আধুনিক যুগের সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন করতে গিয়ে বাইরের দিক থেকে পাশ্চাত্য হয়ে গেছে। তাতে তার লাভও হয়েছে ঢের। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরেই তার সমৃদ্ধি। অপরপক্ষে সে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পরমাণু বোমার মার খেয়েছে। সামরিকতা পরিহার করে এতদিনে সে তার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু পরে হয়তো আবার একই ভুল করবে ও একই সাজা পাবে। এখনো বলবার সময় আসেনি তার শিক্ষা কতদূর আন্তরিক।

ভারত যদি সমস্তক্ষণ চীন রাশিয়া আমেরিকার মতো পরাক্রান্ত হবার কথা ভাবে তা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে জাপানেরই মতো মার খাবে। গান্ধীজী যতদিন ছিলেন ততদিন তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টাই করেছিলেন। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সে শিক্ষা এতদিনে তাঁর শিষ্যরাই ভুলে গেছেন। নতুন করে শেখাবার মতো গুরুই বা কোথায়? গান্ধীজী চিরকাল থাকতেন না, কোন মানুষই থাকে না। কিন্তু তাঁর শিক্ষাও যদি তাঁর সঙ্গে যায় তা হলে কী উপায়? আমরা আধুনিক যুগের অনুরোধে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে পা মিলিয়ে নেব নিশ্চয়। কিন্তু সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি তার মধ্যে পড়ে? তাই

যদি হয় তবে চরম আঘাত প্রতিঘাতের জন্যেও মনটাকে প্রস্তুত করতে হবে। মারতে মারতে মরতে মরতেই লোকে শিখবে যে গান্ধীজী যেটা বলেছিলেন সেইটেই সত্য।

যে দেশের শতকরা সত্তর জন নিরক্ষর, যে দেশে ভূমিহীন ও নিয়মিত কর্মহীন মজুরের সংখ্যা পাঁচ ছয় কোটি, যে দেশে বড়ো বড়ো কয়েকটা শহর বাদ দিলে আর সব মধ্যযুগে পড়ে রয়েছে, সে দেশে কোন্‌টা যে কোন্‌টার চেয়ে জরুরি এককথায় বলা শক্ত। কৃষি না শিল্প না শিক্ষা না পরিবারনিয়ন্ত্রণ? যেটাই হোক গণতন্ত্র ধ্বংস করে বা ঐক্য নষ্ট করে বা রাতারাতি সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করে সুফল হবে না। ক্ষুরধার পন্থা। একবার একটা বিপ্লব হলেই অমনি সামাজিক জট খুলে যায় না। জটকে ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়। রক্তপাতের ইয়ত্তা থাকে না। তাও কি একদিনে চুকে যায়? সেক্ষেত্রেও পঁচিশ বছর বড়ো কম সময়। প্রতিবিপ্লব ওৎ পেতে বসে থাকে। ভিতর থেকে আসে। বাইরে থেকে আসে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

যে দেশ সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্যে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে সে দেশ যদি সামাজিক বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্যে দ্বিখণ্ডিত হয় তাতেই বা আশ্চর্য হবার কী আছে? জার্মানীও কি হয় নি? কোরিয়াও কি হয় নি? ভিয়েৎনামও কি হয় নি? ভারতের মতো এত বৃহৎ দেশ কখনো বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের বলপরীক্ষার পর অখণ্ড থাকতে পারবে না। বাইরের শক্তিরা হস্তক্ষেপ করবেই। দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত হবে। যাঁদের কাছে মতবাদই বড়ো তাঁরা বলবেন, 'বেশ তো! আমরা তো আমাদের অংশে আমাদের খুশিমতো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারব।" পারবেন সেটা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা যাবে যে বিদেশী শক্তিরা দুই প্রান্তেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কোন প্রান্তই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। কর্ণধারণ করেছে বিদেশী সৈন্য। যেমন পূর্ব জার্মানীতে রুশ, পশ্চিম জার্মানীতে ইংরেজ ফরাসী মার্কিন।

দুই শতাব্দী ধরে দখল করে থাকার পর ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করে। আমাদের জীবনে যা ঘটে তা পলাশীর পর আর ঘটেনি। আমরা রামমোহনের চেয়ে বিদ্যাসাগরের চেয়ে বঙ্কিমের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভাগ্যবান। আমাদের এই ভাগ্য কি আমরা যক্ষের ধনের মতো পাহারা দেব না? এর জন্যে প্রাণদান করব না? মিত্র বলে পরিচয় দিয়ে যতবার ভারতে বিদেশী সৈন্য এসেছে ততবার প্রভু হয়ে বসেছে। মিত্র বলে পরিচয়

দিলেই কি অমনি আমরা বিশ্বাস করব যে এরা আমাদের প্রভু হয়ে বসবে না? হিটলার তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, জার্মানদের উদ্ধার করতে দুই দিক থেকে যারা চড়াও হয়েছিল এখনো তারা ফিরে যাবার নামটি করছে না। কারণ তারা এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যালান্স রক্ষা করছে। এদেশেও ব্যালান্স রক্ষার প্রশ্ন উঠবে। যারা আসবে তারা থাকতে আসবে।

অমন মিত্রতায় আমাদের কাজ নেই। আমরা পুরুষানুক্রমে বিদেশী সৈন্যদের পদানত হয়েছি। সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হলে আমাদের আর উদ্ধারের আশা থাকবে না। দেশ হয়তো স্বর্গে পরিণত হবে কিন্তু তেমন স্বর্গ নিয়ে কী করব আমরা!

গান্ধীবর্জিত ভারত

ইংরাজবর্জিত ভারত যে গান্ধীবর্জিত ভারতে পরিণত হবে এ চিন্তা কখনো আমাদের মনে উদয় হয়নি। আমাদের ধারণা ছিল ইংরাজ রাজত্ব হচ্ছে অন্ধকার আর গান্ধী পরিচালিত স্বরাজ হচ্ছে সূর্যালোক। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর আপন রাজ্যে আমরা কী দেখলুম? যেসব উপায়ে একটি নির্বাচিত মন্ত্রী মণ্ডলীকে বিতাড়ন করা হলো ও সেইখানেই দাঁড়ি না টেনে তাঁদের সমর্থক ও বিরোধী ও নিরপেক্ষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত যে আইনসভা সেই নির্বাচিত আইন সভাকেও খতম করা হলো সেটা কি গান্ধীজীর কাছে শেখা উপায়? উদ্দেশ্যটা সাধু হলেই কি উদ্দেশ্যটাও আপনা আপনি শুদ্ধ হয়ে যায়? উপায়কেও শুদ্ধ হতে হবে। নয়তো গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যর্থ। কেবল ব্যর্থ নয় পরিত্যক্ত। তা ছাড়া উদ্দেশ্যটাই যে সাধু তাই বা প্রমাণ হবে কী করে? মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়নি। মন্ত্রীমণ্ডলী নানা কারণে অপ্রিয় হতে পারে কিন্তু আইনসভা কি সর্বসাধারণের প্রতিনিধিসভা নয়? তার উপরে কি সর্বসাধারণের অনাস্থা জন্মেছিল? বহু লোক বিক্ষুব্ধ হলেই কি ধরে নিতে হবে যে সাধারণ নির্বাচনটাই অসিদ্ধ হয়েছিল বা হওয়ার যোগ্য?

এক গুজরাটী বন্ধু বললেন, "মুখ্যমন্ত্রীর যাঁরা সমর্থক তাঁরাই তো আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। খারাপকে যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরাও খারাপ। তাড়াতে হলে তাঁদেরও তাড়াতে হয়। ও যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে।"

হয়তো ঠিকই হয়েছে তবু আরো ঠিক হতো যদি পার্লামেন্টারি কনভেনশন মান্য করা হতো। কিন্তু আজকের দিনে কাউকেই একথা বোঝানো যাবে না। কারণ এর পেছনে ছিল টাকার জোরে আইনসভার সদস্যপদ পাওয়া, টাকার জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ। গুজরাটীদের অঢেল টাকা। কাজেই ওটা প্রকৃতপক্ষে ডেমোক্রাসী নয়, মুসোলিনির ভাষায় প্লুটো-ডেমোক্রাসী। মুসোলিনি সেই অজুহাতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। গুজরাট স্বাধীন দেশ হলে কোনো এক মুসোভাই সেই অজুহাতে ক্ষমতা আত্মসাৎ করতেন। তখন সেটার নাম হতো ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ। গুজরাট স্বাধীন

দেশ নয়। সেখানে আবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আবার টাকার খেলা। ছাত্রদের কি এমন কোনো সংগঠন আছে যার দ্বারা টাকার খেলা বন্ধ হবে? ছাত্রদের না থাক, বড়োদের আছে কি? নির্বাচনের রন্ধ্র দিয়ে আবার যদি দুর্নীতি ঢোকে তবে আবার ছাত্রবিক্ষোভ তথা জন অভ্যুত্থান ঘটতে পারে।

তা হলে কি দুর্নীতির উপর আর কোনো অঙ্কুশ নেই? গুজরাট আজ যা ভাবছে সারা ভারত কাল তা ভাববে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকার বার বার হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু কেন্দ্রও তো একই ব্যাপার ঘটতে পারে। ছাত্রবিক্ষোভ, জনতার রোষ, মন্ত্রীদের বিতাড়ন, পার্লামেণ্টের বিদায়। যতদিন না আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন একক দায়িত্বে রাষ্ট্রপতির শাসন। অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে যদি সাধারণ ধর্মঘট হয় তা হলে সিভিল ও মিলিটারি অফিসারদের উপর সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ। তার থেকে এক ধাপ পরে মিলিটারি শাসন। রাষ্ট্রপতি শিখণ্ডী বা সাক্ষীগোপাল। জনগণ হর্ষধ্বনি করতে পারে, যেমন করেছিল পাকিস্তানে ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খানের অভ্যুদয়ে। পরে হয়তো ঠেকে শিখবে যে দুর্নীতি বা অব্যবস্থা বা ভ্রান্ত নীতির প্রতিকার এভাবে হয় না। নির্বাচনের সময়েই সজাগ হতে হবে, বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। তার পরেও অবিরাম জাগরূক থাকতে হবে। লিবার্টির মূল্য ইটার্নাল ভিজিলান্স। সবাই পাহারা দিতে পারে না, কিন্তু কতক লোক তো পারে। কোথায় সেইসব নিরপেক্ষ প্রহরী? আছেন যাঁরা তাঁরা হয় বিরোধী দলভুক্ত, নয় সংবাদপত্র মালিকের বেতনভুক।

'হিন্দ স্বরাজ' লেখবার সময় পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপর গান্ধীজীর আস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে দেশের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে তিনি উপলব্ধি করেন যে স্বরাজের পর শাসনভার তাঁদের হাতেই পড়বে আর তাঁরা ওই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীই পছন্দ করবেন। তখন তিনি স্থির করেন যে রাষ্ট্রপরিচালকদের পেছনে থাকবেন আর একসারি নেতা, তাঁরা ক্ষমতাভোগী নন ক্ষমতাত্যাগী। তাঁদের কাজ হবে গাইড করা। যেমন অর্জুনকে গাইড করতেন কৃষ্ণ। কিংবা রামকে গাইড করতেন বশিষ্ঠ। কিংবা খ্রীষ্টীয় রাজন্যদের গাইড করতেন খ্রীষ্টীয় সাধুসঙ্ঘ। রাজনীতিকে যদি নীতির আমলে আনতে হয় তা হলে পলিটিকাল লীডারশিপের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে মরাল লীডারশিপ। নিছক রাজনীতি কখনো কোনো মহান দেশের কাম্য হতে

পারে না। গান্ধীজীর স্বরাজ পার্লামেণ্টারি হাতে পারে, ডেমোক্রাটিক হতে পারে, কিন্তু নীতিবর্জিত বা নীতিনিরপেক্ষ হতে পারে না।

কিন্তু কল্পনাটাকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে দেখা গেল যা হয়েছে তার নাম কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। তিনজন উর্ধ্বতন কর্তা সাতটি আটটি মন্ত্রীমণ্ডলীকে গাইড করছেন। দৃশ্যত তাঁরা ক্ষমতাত্যাগী, কার্যত ক্ষমতাভোগী। কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যাবার জোগাড়। তখন সবাই মিলে আবার জেলে যান। শাসনভার ইংরেজের উপরেই পড়ে। পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দুয়ার খুলে যায় তখন ক্ষমতাত্যাগীরাও গিয়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তা হবেন কারা? তেমন উচ্চতা কাদের? গান্ধী ভিন্ন আর কারো নয়। বিনোবা তো কংগ্রেসের বাইরে। গান্ধীজীও সে দায়িত্ব নিতে নারাজ। তাঁকে যেতে হলো নোয়াখালী ও তার পরে বিহার। সেই ফাঁকে বল্গাহীন কংগ্রেস নেতারা দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। কেউ তাঁদের গাইড করেননি, কারো গাইডান্স তাঁরা চাননি। গান্ধীজীর কল্পনা এমনি করেই ব্যর্থ হলো। তখন থেকে অর্জুন নিজেই নিজের সারথি, রাম নিজেই নিজের গুরু, রাজন্যরা সাধুসঙ্ঘের ধার ধারেন না। গান্ধীজী বুঝতে পারেন যে গণসত্যাগ্রহের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহসেনানায়কের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। মরাল লীডারশিপের জন্যে কেউ লালায়িত নয়। তা হলে কি তাঁকে পলিটিকাল লীডারদের সব কথায় সায় দিয়ে যেতে হবে? অন্যায় করলে প্রতিরোধ করতে পারবেন না? প্রতিরোধ করতে গেলে অপোজিশনের পর্যায়ভুক্ত হবেন? অপোজিশন যদি সফল হয় তা হলে সরকার পদত্যাগ করবে, তখন সরকার গঠন করবে কে? বুড়ো বয়সে সে দায় কি গান্ধীজীকেই বহন করতে হবে? মৃত্যু এসে তাঁকে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়ে বাঁচায়। নইলে তাঁকে হায়দারাবাদ অভিযান, গোয়া অভিযান, চীনযুদ্ধও সমর্থন করতে হতো। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ইত্যাদিও মেনে নিতে হতো। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্যে তিনিও দায়ী হতেন।

'মূর্তিবন্দী মহাত্মা' এখন আর কারো কাছে দায়ী নন। সেদিক থেকে তিনি মুক্ত। দায়ী তাঁরাই যাঁরা তাঁর শিষ্য বলে পরিচিত। তাঁর নিজের জন্মস্থান গুজরাটেই তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে উচ্ছেদ করা গেছে। এতে তাঁর নৈতিক উত্তরাধিকারীদেরও প্রতিপত্তি বাড়েনি। তাঁরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা তো শাসনকার্যের প্রত্যক্ষ ভার নেবেন না, পেছনে

থেকে পরামর্শ দিলেও কেউ তাঁদের পরামর্শ শুনবে না। তা হলে কি তাঁরা প্রতিরোধ করবেন? না, তা যদি করেন তবে অপোজিশনের পর্যায়ভুক্ত হবেন। প্রতিরোধ সফল হলে সরকার গঠনের দায় তাঁদের উপরেই বর্তাবে। দায়িত্ব নিতে তাঁরা নারাজ। তা হলে তাঁরাও তো 'মুক্তিবন্দী' সাধুপুরুষ। তাঁরা রক্তমাংসের 'মুক্তিবন্দী'। পরিস্থিতিটা জয়প্রকাশজীর অসহ্য। শুনছি তিনি নাকি বিহারে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে চান। কিন্তু গান্ধীভিন্ন আর কেউ কি কোনদিন সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছেন? বারডৌলিতে বল্লভভাই যেটা করেছিলেন সেটাও গান্ধীজীর নির্দেশে। সত্যাগ্রহ পরিচালনার অভিজ্ঞতা গান্ধীজী হস্তান্তরিত করে যাননি। বিনোবাজীকেও না।

সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝায়? বোঝায় যুদ্ধবিগ্রহের বিকল্প। মরাল ইকুইভালেন্ট অভ ওযার। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে যে কোন বিবেকী ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করতে পারেন। অনেক সময় সেটা তাঁর নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু গণসত্যাগ্রহ হচ্ছে একপ্রকার যুদ্ধ। হাজার হাজার সৈনিক তাতে যোগ দিতে যায়। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। অনিয়ন্ত্রিত হলে তারা মানুষ খুন করে, ঘরে আগুন লাগায়, সম্পত্তি ধ্বংস করে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তারা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের উপর গুলী চালানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। থাকলে তার নাম কর্তৃপক্ষের আত্মসমর্পণ। বলপরীক্ষায় সংবিধানসম্মত সরকারের পরাজয়। তার পরে সরকার একমুহূর্ত তিষ্ঠতে পারে না। তাতে গদী ছেড়ে দিয়ে অরণ্যে যেতে হয়। ভারত সরকার যদি মনে করেন বিহার সরকারের পরাজয় হচ্ছে ভারত সরকারেরই পরাজয় তা হলে সঙ্কট গুরুতর হবে।

অহিংসা বজায় রাখতে পারলে হিংসার কাছে আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না। সম্মানজনক শর্তে মিটমাট হতে পারে। কিন্তু আজকের এই আগ্নেয়গিরিতে অহিংসা বজায় রাখতে পারা কি গান্ধীজীর পক্ষেও সম্ভব হতো? আমরণ অনশনেও কি ঘোরতর হিংসাবাদীদের মন গলত? বলা বাহুল্য আপন জনের বিরুদ্ধে তিনি গণসত্যাগ্রহ পরিচালনা করতেনই না। তাঁর একটি ইঙ্গিতেই কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করতেন। কিন্তু তা হলে আবার তাঁকেই গিয়ে বসতে হতো গদীতে। জয়প্রকাশজী কি সরকার গঠন করতে রাজী হবেন, যদি তাঁর অহিংস আন্দোলন সফল হয়?

এই বিশাল দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে গণসত্যাগ্রহ যে আর কোনো কালেই

আবশ্যক হবে না তা নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে যে তারও সহমরণ ঘটল একথা মনে করলে যুদ্ধবিগ্রহের বিকল্পের উপর আস্থা হারাতে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে যুদ্ধবিগ্রহের বিকল্পহিসাবে গণসত্যাগ্রহ মানবজাতির কাছে গান্ধীজীর তথা ভারতের একটি মহান দান। সুদূর আমেরিকাতেও বহুলোক এখন গান্ধীজীকে তাদের নৈতিক নেতা বলে স্বীকার করে। গণসত্যাগ্রহকে নৈতিক আয়ুধ বলে। কিন্তু তার জন্যে চাই দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি। গণসত্যাগ্রহে যারা যোগ দেবে তাদের সৈনিকের মতো তালিম নিতে হবে। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। সৎ অসৎ বিচার করতে হবে। চরম আত্মদানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। চিত্তকে বিদ্বেষমুক্ত করে বিনা অপরাধে বুলেট বরণ করতে হবে। এরজন্যে চাই সত্যিকার মহত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন। আমার নিজের ধারণা সেরূপ মহত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ভারত সরকার যখন পরমাণু বোমা বানাবার সিদ্ধান্ত নেবেন বা আসন্ন যুদ্ধের জন্যে লক্ষ লক্ষ যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে সৈনিক বানাবেন। আমি অবশ্য বলছিনে যে কংগ্রেস সরকার তেমন কাজ করবেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার কি চিরস্থায়ী সরকার? পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী অপর কোনো দলকেও সরকার গঠনের সুযোগ দিতে পারে। সে দলের পলিসি অন্যরূপ হতে পারে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী যদি খতম হয় বা আপনি ভেঙে পড়ে মিলিটারি বা ফাসিস্ট বা কমিউনিস্ট ডিকটেটরশিপ তার শূন্যতা পূরণ করতে পারে। তার যে পলিসি তা বিরোধ ডেকে আনতে পারে। বিরোধটাকে অহিংস রাখতে হলে গণসত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। কিন্তু তার জন্যে চাই সুদীর্ঘ ও ব্যাপক সাধনা।

মহাত্মার দিন বিগত হয়নি। তাঁর দিন আবার আসবে। আজকের পরিস্থিতিতে যাঁরা গান্ধীপন্থা অনুসরণ করতে উদ্যত তাঁদের কর্তব্য হবে আগে অহিংসার আটঘাট বাঁধা। নীরব সাক্ষী হতে চান না? বেশ তো, পদযাত্রা করুন, পথসভা করুন, ঘরে ঘরে গিয়ে জনগণকে শেখান যে নির্বাচনের সময় যেন অপাত্রে ভোট না দেওয়া হয়, অর্থলোভে ভোট না বেচা হয়। সমস্যাগুলো এখনো সাংবিধানিক সমাধানের বাইরে চলে যায়নি। সংবিধানের চতুঃসীমার ভিতর থেকেও আন্দোলন চালানো যায়। তাতে ফললাভও হয়। একটা দায়িত্বশীল পত্রিকা পরিচালনাও অবশ্যকরণীয় কাজ।

অহিংসার আটঘাট বাঁধা যত দরকারী সত্যের আটঘাট বাঁধা তার চেয়ে কম নয়। সত্য যে কী তা না জানলে সত্যাগ্রহ চালানো যায় না। সত্যের

প্রতি আগ্রহ থেকেই না সত্যাগ্রহ। কিন্তু আজকের দিনে কোথায় সেইসব সংবাদপত্র যাদের রিপোর্ট বা মন্তব্যের উপর নির্ভর করতে পারি? অনেক সময় আমাকে বিদেশী সংবাদপত্র পড়ে স্বদেশের সত্য উদ্ধার করতে হয়েছে। চীন সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার করতে হলে বিদেশী সংবাদপত্র ভিন্ন গতি নেই। আগেকার দিনে আমরা জানতুম যে সেনসরশিপ বলতে বোঝায় সরকারী সেনসরশিপ। এখনকার দিনে তার অর্থ আরো ব্যাপক হয়েছে। মালিকের সেনসরশিপ, পার্টির সেনসরশিপ, জনতার সেনসরশিপ, বিজ্ঞাপকদের সেনসরশিপ। লেখা পাঠালে ঘুরে আসে: "আপনার লেখা ছাপা হলে আলোড়ন হবে।" আমার লেখা অসত্য বলে নয়, অপ্রিয় বলে। তা হলে কী শিক্ষা আমরা জনগণকে দিচ্ছি যে দরকারের সময় তারা সত্যাগ্রহ করবে? সত্যাগ্রহের জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা সংবাদপত্রের মারফৎ দেওয়া যেত বলেই না সত্যাগ্রহের সময় সাড়া পাওয়া যেত। মহাত্মা গান্ধী তাঁর শত কাজের মধ্যেও ইংরেজীতে, গুজরাটীতে ও হিন্দীতে লিখতেন। তাঁর তিনটি পত্রিকার অন্যান্য সংস্করণও ছিল। সত্য সম্বন্ধে গান্ধীশিষ্যদের কি সেই পরিমাণ ঔৎসুক্য আছে? এই যে দুর্নীতির কথা এত বেশী শোনা যায় কোনো একটা কেস নিয়ে কেউ কি অনুসন্ধান করেন ও অনুসন্ধানের ফল নির্ভয়ে প্রকাশ করেন? অতদূর যেতে হবে কেন, গান্ধী হত্যার অনুসন্ধানের পর বিচারপতি জীবনলাল কাপুরের রিপোর্ট পেশ করেছেন, কিন্তু কোথাও সে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। গান্ধীশিষ্যরাও প্রকাশের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ইতিহাস এর জন্যে তাঁদের কাছেও কৈফিয়ৎ চাইবে। কোন্ অপরাধীকে আড়াল করতে চান তাঁরা? তিনি কি তাঁদের নিজেদেরই ঘরের লোক? সত্য চিরদিন চাপা থাকবে না। একদিন মুখে চুনকালি পড়বে তাঁদেরও যাঁরা অপরাধীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ।

গান্ধীজীর কাছে সত্যের স্থান ছিল সকলের উপরে। তার পর অহিংসার। তার পরে ব্রহ্মচর্যের। এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে গান্ধীশিষ্যদের ভিতরে একটা শোধনবাদ লক্ষ করা যায়। তাঁদের কাছে এখন সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। তার পরে অহিংসা। তার পরে সত্য। যেমন ছিল গান্ধীজীর পূর্বে ভারতীয় সন্ন্যাসী সঙ্ঘে। সন্ন্যাসীদের দিয়ে অনেক মহৎ কাজ হয়েছে, কিন্তু সংগ্রাম তার মধ্যে পড়ে না। দেশকে বা জনগণকে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করা বা সংগ্রামকালে নেতৃত্ব দেওয়া সন্ন্যাসীদের দিয়ে কোনো-

কালেই হয় নি। আমার তো বিশ্বাস হয় না যে ভবিষ্যতেও হবে। যদি না তাঁরা সত্যকেই দেন শীর্ষস্থান। গান্ধীজী নতুন একদল সন্ন্যাসী সৃষ্টি করবার জন্যে আসেন নি। এসেছিলেন একদল সত্যাগ্রহী সৃষ্টি করতে। তাই তাঁর সাবরমতীর আশ্রমের নাম ছিল সত্যাগ্রহাশ্রম। ব্রহ্মচর্যাশ্রম নয়। তার বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের উপরে লক্ষ্য স্থির রেখে অহিংসার অনুশীলন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের, যাতে সৈনিকরা পরিবারের ভাবনা ছেড়ে দেশের বা জনগণের ভাবনায় মন দিতে পারেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হলে, কারাগারে বছরের পর বছর কাটাতে হলে বিবাহ যদি প্রতিবন্ধক না হয় তবে সহবাস তার প্রতিবন্ধক। কারণ তার মধ্যে প্রজননের সম্ভাবনা থাকে। গান্ধীশিষ্যরা যদি সত্যের উপরে সব চেয়ে বেশী জোর দিতেন তা হলে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাজার রকম চাতুরী তাঁদের নজরে পড়ত আর তাঁদের মুখে বা লেখনীমুখে উদ্‌ঘাটিত হতো। জনসাধারণের শ্রমলব্ধ অর্থ নিয়ে এই যে দেশজোড়া হরির লুট চলেছে এটা যদি সেই উপায়ে বন্ধ হতো তা হলে ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের দরকার হতো না। তার দরুণ যে অব্যবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে সে সবও ঘটত না। ছেলেরাও স্বপ্ন দেখত না যে "বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা আসে।" সন্ন্যাসীরা এদেশকে কোনোদিন কি বাঁচিয়েছেন যে এরে বাঁচাবেন?

গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ', কার্ল মার্কসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', মাও-সে-তুং-এর লাল কেতাব ইত্যাদি নানা মুনির নানা থীসিস আমাদের প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু কোনোটাই এ দেশে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কেন নয় তার কারণ আমরা নানা ভাগে বিভক্ত ও নানা যুগে অবস্থিত পঞ্চান্ন কোটি লোক। কতক মধ্যযুগে, কতক প্রাচীনযুগে। ন্যাশনালিজম আমাদের একসূত্রে গেঁথেছে, কিন্তু সুতোটা রেশমী সুতো। ওটাকে ইস্পাতের তার ভেবে জোরে টান দিতে গেলে ছিঁড়ে যাবে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী আমাদের সকলের হাতে ভোট দিয়েছে, আমরা সকলেই ইচ্ছামতো ভোট দিয়ে শাসক নির্বাচন ও পরিবর্তন করবার অধিকারী। কিন্তু এর অপব্যবহার অহরহ ঘটছে। অনেকেই ভাবছেন দোষটা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর। পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র বা পীপলস ডেমোক্রাসী হলে নির্দোষ হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একই রকম সমালোচনা শোনা যেত। মোড়লরাও গাঁয়ের লোকের উপর প্রভুত্ব করত। মন্ত্র আওড়াত অজ্ঞ ভাষায়। আসল কথা হলো

প্রত্যেকটি নাগরিককে সচেতন হতে হবে যে কর্তার ইচ্ছায় কর্মের দিন গেছে। এখন থেকে নির্বাচকদের ইচ্ছায় কর্ম। তা যদি না হয় তবে আবার গণসত্যাগ্রহের মূল্য দিয়ে গণতন্ত্রকে কিনতে হবে। এখন পর্যন্ত পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় নি। একে আরো সুযোগ দিতে হবে। একটা দায়িত্বশীল বিরোধী পক্ষ এখনও গড়ে উঠল না। অথচ সেটাও পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার আবশ্যক অঙ্গ।

গান্ধীজী যেটা কল্পনা করেছিলেন সেইটেই ছিল ঠিক। পালিটিকাল লীডারশিপের নেপথ্যে মরাল লীডারশিপ না থাকলে রাজনীতি হয়ে উঠতে পারে নীতিবর্জিত বা নীতিনিরপেক্ষ। সেইজন্যে চাই আর এক সারি নেতা। যাঁরা ক্ষমতাভাগী বা ক্ষমতাভোগী হবেন না, হবেন ক্ষমতাত্যাগী অথচ প্রভাবসম্পন্ন। প্রতিকার বা সংশোধনের জন্যে সাধারণ লোক তাঁদের দিকে তাকাবে। তাঁরা অন্তত মুখ ফুটে একবার বলবেন যে "এটা অন্যায়।" তাঁরা একবার মুখ খুললে গুজরাটের ঘটনা হয়তো মাঝপথে থেমে যেত। এতগুলো লোক মরত না। সঙ্কটক্ষণে মৌন থাকাও অন্যায়।

অন্যায় যে সব সময় সরকারপক্ষেই হয় তা নয়, অনেক সময় বিরোধীপক্ষেও হয়। জনগণও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। গান্ধীজী তো জনগণকেও সংশোধন করতেন অপ্রিয়তার জন্যে পরোয়া না করে। মরাল লীডারশিপ কেবল রাজনীতিকদের সংশোধনের জন্যে নয়, সাধারণের সংশোধনের জন্যেও। রাজনীতিকদের সংশোধনের অন্য উপায় আছে, যেমন গুজরাটের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, কিন্তু সাধারণের সংশোধনের আর কী উপায় আছে? মিলিটারির গুলীবর্ষণ? আমি ভেবে পাইনে কেন আমাদের নৈতিক প্রভাবসম্পন্ন পুরুষরা মিলিটারির গুলীবর্ষণের পূর্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন না। শান্তিসেনা যখন গিয়ে হাজির হয় তার আগেই পুলিশ কিংবা মিলিটারী গুলী চালিয়ে বা বুকে হাঁটিয়ে জনতাকে শান্ত করেছে। হাঁ, আহ্মদাবাদে একবার বুকে হাঁটার হুকুমও দেওয়া হয়েছিল। অমৃতসরে জেনারল ডায়ারের মতো। এবার কিন্তু ইংরেজ সেনাপতির দ্বারা নয়।

গান্ধীবর্জিত ভারত এখনো গান্ধীশিষ্যবর্জিত ভারত হয়নি। যতদিন তাঁরা জীবিত আছেন জবাবদিহির দায় তাঁদের। সে দায় বুদ্ধিজীবীদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে তাঁরা খালাস পাবেন, তা নয়। বুদ্ধিজীবীদেরও কর্তব্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাঁদের কাজ হচ্ছে প্রথমে সত্য নির্ধারণ। সেটা করতে করতেই মাসের

পর মাস গড়িয়ে যেতে পারে। তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিবিয়ে দিতে পারেন না। দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারেন না। এর জন্যে চাই নৈতিক শক্তি। যাঁদের সে শক্তি আছে তাঁদেরই সেটা কর্তব্য। সত্যাগ্রহ করতে গেলে তাঁরা ভিতর থেকে জোর পাবেন কী করে, যদি প্রাণভয়ে বা অন্য কোনো কারণে ঘটনাস্থল থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন ও পরে একটা লোকদেখানো অনশন করেন ? ততক্ষণে শতাধিক প্রাণ বিনষ্ট।

গান্ধীজী যদি আজ থাকতেন

শোনা গেল একজন পুরাতন গান্ধীবাদী কর্মী নাকি বলেছেন, "গান্ধীজী যদি আজ থাকতেন তা হলে তিনিও হিংসার পথ ধরতেন।"

শুনে বিস্মিত হলুম। কারণ তিনিও যদি হিংসার পথ ধরতেন তাহলে জগতে কি একজনও গান্ধীবাদী থাকতেন? তখন কোন্ গুণে লোক তাঁকে লেনিন, স্টালিন, মাও প্রভৃতি মহানেতাদের থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করত? কেনই বা লোকে লেনিনপন্থা বা মাও-পন্থা ছেড়ে গান্ধীপন্থা অবলম্বন করত?

অহিংসায় গান্ধীজীর চেয়ে বড়ো আধুনিক যুগের ইতিহাসে কেউ ছিলেন না, কেউ নেই। কিন্তু হিংসায় তাঁর চেয়ে বড়ো নিশ্চয়ই বহু জননায়ক ছিলেন ও আছেন। গান্ধীজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন ও হিংসার পথ ধরতেন তাহলে ভারতকে পরামর্শ দিতেন পরমাণু বোমা বানাতে। কিন্তু ভারতের সেই পরমাণু বোমার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা ইতিমধ্যেই মার্কিন, রুশ, ইংরেজ ও চীনারা বানিয়েছে। ফরাসীরাও বানাতে যাচ্ছে। আর ভারত যতদিনে বানাবে জাপান, কানাডা, ব্রাজিল, ইস্রায়েল, ইরান প্রভৃতি দেশও বানাতে চাইলে বানাতে পারবে। হিংসার প্রতিযোগিতায় ভারত যে প্রথমস্থানীয় হবে তা নয়। হবে বড়জোর সপ্তম কি অষ্টমস্থানীয়। আমরা জার্মানদের বাদ দিয়ে ভাবি। কিন্তু তাদের পূর্বশত্রুদের মনোভাব যদি বদলায় তবে তারাও হাইড্রোজেন বোমা বানাবার সামর্থ্য রাখে। তখন তারাই হবে পঞ্চম কি ষষ্ঠ মহাশক্তি।

বুঝতেই পারছি যে হাতে একটা সৈন্যদল পেয়ে আমাদের মাথা ঘুরে গেছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের মাথাটাকে আরো অনেকখানি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ফলে আমাদের শত্রুবৃদ্ধি হয়েছে। মিত্রবৃদ্ধি হয়নি। এককভাবে লড়াই করে ভারত মার্কিনের সঙ্গে পারবে, না রুশের সঙ্গে পারবে, না চীনের সঙ্গে পারবে? লড়তে গেলে একটা না একটা শক্তিজোটের সামিল হতে হবে। যেটারই হোক না কেন স্বাধীনতা খর্ব হবে। তাহলে কি নিজেই একটা স্বতন্ত্র শক্তিজোট গড়ে তুলবে? কার কার সঙ্গে? পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, বর্মা, সিংহল কেউ কি তার সঙ্গে জোট

বাঁধতে চাইবে? তাদেরও তো স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার ভয় আছে। তারাও তাদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। ভারতের বিরুদ্ধে তারাই হয়তো জোটবন্দী হবে। পকিস্তান তো বহুদিন থেকেই সেন্টোর সদস্য। তুরস্কও ইরানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

নিছক আত্মরক্ষার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অন্যায় নয়। তবে পাকিস্তানের বোধ হয় আরেক দফা লড়বার অভিপ্রায় আছে কাশ্মীর জয় করবার আশায়। তেমন একটা সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভালো, কিন্তু যুদ্ধ জিতে পাকিস্তানকে ভারতের সামিল করার কথা স্বপ্নেও ঠাই দেওয়া উচিত নয়। তেমনি বাংলাদেশকেও। যে কারণেই হোক সে দেশের বহুসংখ্যক রাজনীতিক ভারতের উপর বিরূপ হয়ে আবার পাকিস্তানের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। সে স্বাধীনতা তাঁদের আছে। আত্মরক্ষার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অন্যায় নয়। আমরা তো মনে করি ভারতের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নই ওঠে না, তাহলেও দেখে শুনে মনে হচ্ছে আত্মরক্ষার খাতিরে বাংলাদেশও সম্ভবত পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। আমাদের নীতি যুদ্ধ এড়িয়ে চলা, যুদ্ধের দিকে পা বাড়িয়ে দেওয়া নয়। আক্রান্ত না হলে আমরা যুদ্ধ করব না। জয়ী হলেও আমরা পররাজ্য গ্রাস করব না। গ্রাস করা সম্ভব হলেও হজম করা সম্ভব নয়। সংযুক্ত ভারতে যারা ভারতীয় নাগরিক হবে তারা পরে একদিন বিদ্রোহী হবে। অখণ্ড ভারত যাঁদের স্বপ্ন তাঁদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, যদি বিদ্রোহীরা হয় সংখ্যায় বারো তেরোকোটি।

গান্ধীজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে সামরিকতার বিরুদ্ধেই সবাইকে পরামর্শ দিতেন। যেমন ভারতকে তেমনি পাকিস্তানকে তেমনি বাংলাদেশকে তেমনি আর সব দেশকে। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করে আরো একটা বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা হচ্ছে। গান্ধীজী কখনো এই অনিবার্যতাকে মাথা পেতে নিতেন না। এতে উৎসাহ দিতেন না। শান্তিবাদী তিনি সর্বপ্রথমে ভারতকেই নিরস্ত্রীকরণের দৃষ্টান্ত দেখাতে বলতেন। কেউ শুনত না অবশ্য তাঁর পরামর্শ। তাহলেও সেই হতো তাঁর পন্থা। অন্য পন্থা নেইও। সামরিকতার ভারে প্রপীড়িত দেশগুলির প্রত্যেকটাতেই এখন প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি। এর একমাত্র সার্থক প্রতিকার নিরস্ত্রীকরণ। কিন্তু কেউ সেকথা স্বীকার করবে না। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস তাদের যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে না যাক মুদ্রাস্ফীতির চরম অবস্থার অভিমুখে

নিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ দেখে ইংরেজরাই আতঙ্কিত। পাউণ্ডের সঙ্কটমোচন সহজে সম্ভব নয়। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও আছে। সেটা হয়তো অহিংস আকার নেবে। কোনো এক গান্ধীর নেতৃত্বে হয়তো।

গান্ধী নেই, কিন্তু তাঁর প্রয়োজন আছে এইরূপ সন্ধিক্ষণে যখন বিশ্বযুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে নানা দেশে। হিংসার উত্তর যদি হয় প্রতিহিংসা বা অতিহিংসা তাহলে অবশ্য গান্ধীজীর কোথাও আজ স্থান নেই। তাঁর স্বদেশেও না। কিন্তু এখনো কতক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে হিংসার উত্তর হচ্ছে কম হিংসা, আরো কম হিংসা, শেষে অহিংসা। এক লম্ফে অহিংস হওয়া শক্ত। কিন্তু ধীরস্থির ভাবে অহিংস হওয়া অসম্ভব নয়। অন্তত গান্ধী-পন্থী বলে যাঁরা পরিচয় দেন সেই কয়জন ব্যক্তির সেইটেই বিশ্বাস। মুদ্রাস্ফীতির দাপটে ত্রাহি ত্রাহি করবে যারা তারা হিংসার পথ ধরে পাথরের দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে চায় মরবে। কিন্তু পরিত্রাণ সে পথে নয়। তাদের দৌড় তো ওই বিপ্লব অবধি। সেটার পিঠ পিঠ ঘটবে প্রতিবিপ্লব। আগে থেকেও ঘটতে পারে। ফাসিজম মানে কী? মানে বিপ্লবের পূর্বেই প্রতিবিপ্লব।

গান্ধীজীর অহিংসা শাস্ত্রীয় অহিংসা নয়। এটা একটা নৈতিক বিকল্প। যুদ্ধের তথা বিপ্লবের। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। বাধতও একদিন না একদিন। গান্ধীজী নিয়ে এলেন এক নৈতিক বিকল্প। গণসত্যাগ্রহ। দেশের লোক বিনা অস্ত্রে লড়বার একটা উপায় পেয়ে গেল। সেইজন্যই তো তাঁকে মহানেতা বলে বরণ করে নিল। অহিংসার যে প্রাচীন অর্থ সে অর্থে তিনি মহাত্মা। কিন্তু অহিংসার যে আধুনিক অর্থ সে অর্থে তিনি মহানেতা বা গণনায়ক। মূলনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সব ক'টা নীতি নিয়ে তিনি জনগণের পুরোভাগে। যেন তাঁর জীবনটাই নিরবচ্ছিন্ন একটা দাণ্ডী অভিযান। যার ছবি এঁকেছেন নন্দলাল বসু। সব সময়ে তিনি সামনে এগিয়ে চলছেন। কেউ নেই তাঁর চেয়ে আরো এগিয়ে। এমন যে গান্ধীজী কোন্ দুঃখে তিনি হিংসার পথ ধরবেন? যে পথ রক্তাক্ত, পঙ্কিল, গতানুগতিক।

তবে একথাও তিনি বলেছেন যে কাপুরুষতা কদাপি নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ হিংসাও শ্রেয়। একটু ঘুরিয়ে বলতে পারা যায়, তামসিকতা কদাপি নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ রাজসিকতা শ্রেয়। যারা কাপুরুষ হতে নারাজ তারা বরঞ্চ হিংসার পথ ধরতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের মনে রাখতে হবে যে

প্রতিপক্ষ কখনও ক্ষমা করবে না। সেও প্রতিহিংসার পথ নেবে। হয়তো তার হিংসাই অতিহিংসা। সুপারভায়োলেন্স। তার সঙ্গে মোকাবিলায় মার খাওয়া অবধারিত। তখন করুণ সুরে বিলাপ করলে চলবে না যে, আমি তো কিছু করিনি, ওরাই করেছে। করবেই তো। হিংসার উত্তরে তাদের হাতে আর কী অস্ত্র আছে? ওরা কি গান্ধীজীর মতো অহিংসাবাদী? ওরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুলেট খাবে? মনে মনে প্রার্থনা করবে, প্রভু, তুমি এদের ক্ষমা করো?

গান্ধীজীর পথ তাঁর স্বদেশ একরকম পরিত্যাগই করেছে। যে দু'চারজন এখনো গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দেন তাঁরা যেন অন্ততঃ এইটুকু করেন যে তাঁকেও হিংসার পথে নামিয়ে না আনেন! নিজেরা নামতে চান নামুন। যদি হিংসার পথে কিছু সাফল্য দেখাতে পারেন দেখান। যদি জনগণের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দিতে চান দিন। কিন্তু গান্ধীজী বেঁচে থাকলে কোন মতেই এসব সমর্থন করতেন না। তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্য প্রকার। ইতিহাসে ওই একটিই গান্ধী হয়েছে। ওঁকে চেঙ্গিস, তৈমুর, নেপোলিয়ন, হিটলারের অনুবর্তী করলে ওঁর মহত্ত্ব বাড়ে না। বাড়ে উত্তরপুরুষের অগ্রবর্তী করলে। সে উত্তরপুরুষ হয়তো ভারতীয় নয়, আমেরিকার নিগ্রো কি রাশিয়ার ইহুদী। তবু সেই ধারাটাই গান্ধী ধারা। তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন বলে যে আমরাই তাঁর উত্তরাধিকারী তা নয়। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর অহিংসা নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর শিষ্যরা কেউ কেউ করেছে, কিন্তু দিল্লীর উপরেই সকলের দৃষ্টি। তাঁদের উপরে নয়। আর তাঁরাও যে সংগ্রামের সময় নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক বা সক্ষম তা নয়। সংগ্রাম পরিহার করাই তাঁদের রীতি। নীতি যাই হোক না কেন। তাদের দৃষ্টান্ত দেখে গান্ধীবাদীরা যদি গান্ধীতত্ত্ব ভুলে গিয়ে থাকেন তবে আমরা কে কী করতে পারি? কেবল আশা করতে পারি যে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে গান্ধীজীকে তাঁদের মনে পড়বে। কিন্তু চেঙ্গিস বা নেপোলিয়নরূপী গান্ধীকে নয়। চরকাধারী গান্ধীকেই আমরা চিনি। চক্রধারী গান্ধীকে নয়। সংগ্রামের জন্যে তিনি এ জগতে এসেছিলেন, কিন্তু সে সংগ্রাম নৈতিক বিকল্প। যুদ্ধের তথা বিপ্লবের।

হতেও পারে যে বুদ্ধ মহাবীরের শিষ্যপরম্পরার শিক্ষার ফলে ভারতীয় জনগণের চরিত্রে অহিংসার জন্যে প্রস্তুতি নিহিত ছিল। সেইজন্যেই তিনি

বিপুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু সেই প্রস্তুতি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই ত্রিশ বছরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? যখনি সংগ্রামের সময় আসে তখনি লোকে মারমূর্তি ধরে। অথবা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। ভারতীয়দের জীবনধারার অহিংসার পরিমাণ বড়ো কম নয়। এত অধিকসংখ্যক নিরামিষভোজী অপর কোন দেশে আছে কি? ভারতের লোক সবাই প্রাণ নিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু এর উল্টোদিকটাও সত্য। ভারতের লোক প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত। এর মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে। আমরা যখন মারতে নারাজ, তখন মরতে রাজী হব কেন? তার চেয়ে পালাব। পালিয়ে বাঁচব। যঃ পলায়তি স জীবতি। গান্ধীজী সে ক্ষেত্রে বেহিসাবী। তিনি মারতে নারাজ কিন্তু মরতে নারাজ নন। মরতে রাজী, কিন্তু মারতে রাজী নন। আমরা ক'জনই বা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি বা করতে পারি বা করবার যোগ্য? আমি তো সেই কারণে গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী বলে পরিচয় দিইনে। যাঁরা দেন তাঁদেরও মনের ভিতরে দ্বিধা আছে। তাঁরা হিসাবী মানুষ। প্রাণ যদি না নেবেন তো প্রাণ দেবেন কেন? তার চেয়ে মারামারি ভালো। তাতে একটা দেওয়া নেওয়ার হিসাব আছে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে। কোন্ পক্ষে ক'হাজার বা ক'লাখ নিহত। যারা হারে তারাও সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে তারাও তো হাজার হাজার লাখো লাখো মেরেছে।

ভারত এখনও গান্ধীজীকে নীতিনির্ধারকরূপে গ্রহণ করেনি। কবে করবে কে জানে? গান্ধীজীকে যাঁরা নেতারূপে বরণ করেছিলেন তাঁরা প্রথমত ও প্রধানত জাতীয়তাবাদী। দেশের স্বাধীনতার জন্যেই তাঁরা নেতার চারিদিকে সমবেত হয়েছিলেন। অহিংসার জন্যেও কতক কর্মী তাঁর সহচর হয়েছিলেন, কিন্তু অহিংসা তাঁদের কাছেও জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল না। যেমন ছিল জাতীয় স্বাধীনতা। অহিংসার জন্যেই বাঁচব, অহিংসার জন্যেই মরব এমন পণ একমাত্র গান্ধীজীরই ছিল, তাঁর পরে যদি কারো নাম করতে হয় তিনি সীমান্ত গান্ধী খান্ আবদুল গফ্ফার খান্। পাকিস্তানের অত্যাচারে তিনিও এখন অহিংসায় আস্থা হারিয়েছেন বলে শুনি। এই দুটি গান্ধীকেই আমি দেখেছি। তৃতীয় জন যদি বিনোবাজী হয়ে থাকেন তবে তাঁকেও আমি চিনি, কিন্তু তাঁর সে অহিংসা তো মুনি ঋষির অহিংসা। সাধু সন্তের অহিংসা। একভাবে তিনি কখনো কোনো অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করেননি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁকে প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে মনোনীত

করেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু প্রথম সত্যাগ্রহী আর কারো পরিচালক বা পথ প্রদর্শক ছিলেন না। এমন কি, দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী জবাহরলালজীরও না। গান্ধীজীর সংগ্রামী উত্তরাধিকার যদি কারো উপর বর্তে থাকে তবে তিনি সীমান্ত গান্ধী। কিন্তু তাঁর পরিচালনা শুধু খুদাই খিদমদগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রধানত ও প্রথমত তারা সমাজসেবী। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক কর্মী। পাকিস্তান তাদের মাজা ভেঙে দেয়।

ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনে গান্ধীজীর একটি অধ্যায় ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে অধ্যায় জাতীয়তাবাদী চার অধ্যায়ের এক অধ্যায়! প্রথম অধ্যায়টা দাদাভাই নওরোজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মডারেটদের। দ্বিতীয় অধ্যায়টা বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ একস্‌ট্রিমিস্টদের। তৃতীয় অধ্যায়টা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদী গোষ্ঠীর। চতুর্থ অধ্যায়টাই গান্ধীজীর। বলা বাহুল্য অধ্যায়গুলি এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ নয়। দুই বা তিন অধ্যায় একই সময়ে সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। মডারেটদের অস্তিত্বও গান্ধীজীর অধ্যায়ে ছিল। তেমনি সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদীদের প্রতিপত্তি শেষপর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। বিশেষত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কল্যাণে। ওদিকে একস্ট্রিমিস্টরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী শিবিরে যোগ দিয়ে কার্যত সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয়ে দাঁড়ান। এঁদেরি একজনের হাতে গান্ধীজীর নিধন। ঘটনাটা আকস্মিক নয়। আগেও কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল তাঁকে পৃথিবী থেকে সরাতে। যেহেতু তিনি হিন্দুর শত্রু। এই বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বলে যাঁদের পরিচয় তাঁদের মধ্যে আমি এটা লক্ষ করেছি। নিহত হয়েও তিনি তথাকথিত অপরাধ থেকে নিস্কৃতি পাননি। গান্ধীজীর জন্যেই তো দেশটা ভাগ হয়ে গেল। গান্ধীজীর জন্যেই তো মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য। ইতিমধ্যেই এঁরা ভুলে গেছেন গান্ধীজীর জন্যে কত লক্ষ প্রাণ রক্ষা পেল। স্বাধীনতা দিবসে যদি কলকাতায় দাঙ্গা বাধত ঢাকা তার পাল্টা জবাব দিত ও দেখতে দেখতে দাঙ্গা দুই পারেই ছড়িয়ে পড়ত। ঠিক পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মতো। সেখানে তবু মিলিটারি ছিল অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনতে। এখানে তখন মিলিটারি কোথায়? কার সাধ্য আয়ত্তে আনে? এখানে ছিলেন গান্ধী ও এখানে ছিল অহিংসা। সেইজন্যে অসংখ্য মানুষ রক্ষা পেল। তবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করা অযথা। তাদের অভিযোগ হলো

দেশভাগের জন্যে গান্ধীই দায়ী। দেশভাগে যেন কেবল হিন্দুদেরই সর্বনাশ! দেশভাগে যেন হিন্দুদের কারো বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি!

অহিংসার কথাই এতক্ষণ বলা হলো, সত্যের কথা বলা হয়নি। সত্য যে কী তা লোকে এখনো জানে না, জানতে চায়ও না। যেদিন জানতে চাইবে ও জানবে সেদিন গান্ধীজীকে নতুন চোখে দেখবে।

যেখানেই হিংসার সবচেয়ে বেশী প্রকোপ সেইখানেই অহিংসার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এই হলো গান্ধীজীর জীবনের সারসত্য। এই সত্যের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এই সত্যের বার্তা দিতে দিতেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হলো। এই বার্তাই তাঁর শেষ হৃৎস্পন্দনের বার্তা! বেঁচে থাকলে এই সত্য প্রয়োগ করার জন্যই তিনি বেঁচে থাকতেন। অপর কোন সত্যের নয়।

হিংসার চরম অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদলন। প্রতিহিংসা বা অতিহিংসার পথে সমাধান সম্ভব ছিল না। তাহলে কি আবেদন ও নিবদনের পথে? বহুদিন ধরে আবেদন ও নিবেদন করে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা যখন সম্পূর্ণ নিরুপায় সেই সন্ধিক্ষণে অহিংস পদ্ধতির সংগ্রাম প্রবর্তন করেন গান্ধীজী। এই পদ্ধতির নামকরণ হয় সত্যাগ্রহ। পূর্ব পরিচিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের থেকে এটা ভিন্ন। এটা প্যাসিভ নয়, অ্যাকটিভ। অথচ বন্ধুতার হস্ত সর্বদা প্রসারিত। এর টেকনিক গান্ধীজীর স্বকীয় উদ্‌ভাবন। যদিও আইডিয়াটা বহুকালের ও বহুদেশের প্রতিরোধকারীদের।

হিংসার চরম অবস্থা আবার দেখা দেয় গান্ধীজীর জীবনে। এবার ভারতে। একপক্ষ শক্তিমত্ত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভের পূর্বে তাঁরা ছিলেন ভারতীয়দের সহযোগিতার জন্য উদ্‌গ্রীব। জয়লাভের পরে তাঁদের সাবেক মূর্তি ধারণ করেন। পাশ করেন রাউলাট আইন। দেশসুদ্ধ লোক যখন প্রতিরোধের জন্য উন্মুখ অথচ হিংসার উত্তর প্রতিহিংসায় বা অতিহিংসায় দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর দিকে তাকায় ও তিনি উত্তর দেন অহিংসায়। সেই থেকে শুরু হয় গান্ধী নেতৃত্ব। সকলেই যে মেনে নেয় তা নয়। যারা মেনে নেয় তারাও পরে ভিন্ন মার্গে চলে। কিন্তু বরাবরের জন্য স্থির হয়ে যায় কোনটা গান্ধীমার্গ। মার্গচ্যুতি বা মার্গত্যাগ আর যার বেলাই সত্য হোক তাঁর বেলা সত্য নয়।

হিংসার চরম অবস্থা আবার উদয় হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে।

সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা জয় করে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে জাপানী ফৌজ। আর হটতে হটতে ফিরে আসছে ব্রিটিশ ফৌজ। কোথায় যে তারা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ জানে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে একজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসার বলেন রাঁচীর কাছাকাছি। তার মানে ওরা বাংলাদেশ থেকেও অপসরণ করবে। তা করতে চায় করুক, কিন্তু ক্ষমতাটা হস্তান্তর করে যাবে কাকে ? ভারতীয়দেরকে ? না, কার্যত জাপানীদেরকেই। তার মানে, আমাদের প্রভু হবে ইংরেজের জায়গায় জাপানী। সংগ্রাম করতে হলে আমাদের নতুন করে করতে হবে জাপানীদের সঙ্গে। ওদিকে ইংরেজরা আবার বল সঞ্চয় করে এগিয়ে আসবে, জাপানীদের হটাবার ক্ষমতা ফিরে পাবে। আমরা আরো একবার নতুন করে সংগ্রামে নামব, ইংরেজদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে দুই পক্ষই বাংলাদেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে থাকবে। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে থাকবে কলকারখানা, রেল স্টেশন, হাওড়া ব্রিজ, লোহার থান। যাকে বলে 'পোড়ামাটি' পলিসি, সে পলিসি বর্মায় পরীক্ষিত হয়ে বর্মার লোকের সর্বনাশ ঘটায়। বাংলাদেশেও পরীক্ষিত হতো। আগেভাগেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হলো। যাতে শত্রুরা পার হতে না পারে। খাদ্যদ্রব্যও জলে পড়ল। যাতে শত্রুরা খেতে না পায়। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। মরে জাপানীরা নয়, ভারতীয়রাই।

হিংসার চরম অবস্থা পুনর্বার। নেতা হবে কে ? গান্ধীজী ভিন্ন আর কে ? তিনিই ইংরেজদের বলেন, তোমরা অপসরণ করতে চাও করো, কিন্তু আমাদের ছেড়ে দাও আমাদেরই হাতে, জাপানীদের হাতে নয়। আমাদের দেশ আমরাই রক্ষা করব। যারা পারবে তারা অহিংসভাবে করবে। যারা পারবে না তারা সহিংসভাবে করবে। সবাইকে একভাবে না একভাবে লড়তে হবে। জাপানীদের স্বাগত করা যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। প্রত্যেকেই মনে করবে সে স্বাধীন। না ইংরেজ, না জাপানী, কেউ আমাদের প্রভু নয়। বরং অরাজকতাও শ্রেয়, তবু পরাধীনতার আর একটা দিনও নয়। তবে ইংরেজরা যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে আমরা হব ওদের বন্ধু।

যে কথাটা অনুক্ত থেকে গেল সেটা ছিল, তেমনি জাপানীরাও যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে আমরা হব ওদেরও বন্ধু। বন্ধু হিসাবে আমরা মধ্যস্থতা করব ও শান্তিস্থাপন করব। কী লাভ যুদ্ধবিগ্রহ করে ? সব ঝগড়াই

আপোসে মিটিয়ে দেওয়া যায়। দাও না কেন আমাকে একটা সুযোগ। দিয়ে দেখ আমি কী করি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের পলিসি ছিল, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে জার্মানীকে, ইটালীকে, জাপানকে। সন্ধি যে হবে সেটা একপক্ষের উপর অপরপক্ষের চাপানো। এ পলিসি মার্কিন অথবা রুশ রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও। গান্ধীজীর শান্তি পরিকল্পনার মধ্যে যেটা ছিল সেটা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ নয়, সেটা সম্মানজনক শর্তে মিটমাট। গান্ধীজীকে তাঁদের কিসের দরকার? কে তিনি? একটা পরাধীন দেশের নাগরিক বই তো নয়। পাঠাও ওঁকে উগাণ্ডায় বা এডেনে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় পুনার আগা খানের প্রাসাদে। মাস ছয়েক দেখে তিনি তিন সপ্তাহ অনশন করেন দুনিয়াকে জানাতে যে তিনি নির্দোষ। তিনি কারো শত্রু নন। তিনি চান ভারতের স্বাধীনতা ও সেই সূত্রে জগতের শান্তি।

আসলে ইংরেজদের অপসরণটা ছিল আংশিক ও সাময়িক অপসরণ। বাংলাদেশ ও আসাম বেহাত হলেও অবশিষ্ট ভারত তাদের দখলে থাকত। কোন দুঃখে তারা ভারত ত্যাগ করবে? আর ত্যাগ করলে কার অনুকূলে করবে? কংগ্রেসের? কংগ্রেস কি অন্যান্য দলের উপর প্রভু হয়ে বসবে না? ওদিকে মুসলিম লীগও চীৎকার করছিল সে কখনো প্রভুপরিবর্তন সহ্য করবে না। ত্যাগ যদি কর তো ভাগ করে ত্যাগ কর। এই তার দাবী। সামগ্রিক ও স্থায়ী অপসরণের দিন পরিশেষে এগিয়ে এল। হিটলার ততদিনে খতম। জার্মানী ভাগ হয়ে গেছে বিজেতাদের মধ্যে। ইংরেজের ভাগ দখলে রাখতে হলে সৈন্য চাই পশ্চিম জার্মানীতে তথা বার্লিনে। ভারত দখলে রাখতে গেলে জার্মানী যায়। জার্মানী দখলে রাখতে গেলে ভারত যায়। বুদ্ধিমান জাতি ইংরেজ। তারা বুঝতে পারে তাদের এক নম্বর শত্রু রাশিয়া। তাকে রুখতে হলে রুখতে হয় পশ্চিম জার্মানীতে। ভারত থেকে অপসরণই শ্রেয়, কিন্তু একমাত্র কংগ্রেসের অনুকূলে কদাপি নয়। চাই কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের মিটমাট। নয়তো বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা সম্প্রদান করে কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে যেতে হবে। কেন্দ্রকে ভাগ করার দায়িত্ব ইংরেজরা নিত না।

কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সরাসরি কথাবার্তা বন্ধ হয়েছিল। বড়লাটের মধ্যস্থতায় যেটা চলছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে তার ফলে বড়লাটের সঙ্গেও

নেতাদের কথাবার্তা হতো বন্ধ। হিংসা ইতিমধ্যে বহুদূর গড়িয়েছিল। এরপর পরিণত হতো গৃহযুদ্ধে। তাতে সৈনিকরাও যোগ দিত। কংগ্রেস নেতারা তার দায়িত্ব নিতে নারাজ। তাঁরা দেশভাগে রাজী, যদি সেইসঙ্গে হয় প্রদেশ ভাগাভাগি। গান্ধীজীর মতে দুটোই অন্যায়। এক অন্যায়ের প্রতিকার আরেক অন্যায় নয়। যেমন হিংসার প্রতিকার নয় প্রতিহিংসা। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, এবার মুসলিম লীগের সঙ্গে সংগ্রাম। এ সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্ব তেমন অপরিহার্য ছিল না। কারণ অহিংস সংগ্রাম তেমন কাজ দিত না। সহিংস সংগ্রামে নেতৃত্ব করার জন্যে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। ব্রিটিশ অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাই গান্ধীজীরও অপসারণ ঘটল।

এর পর 'একলা চল রে'। হিংসার চরম অবস্থা সাম্প্রদায়িক হানাহানি। চাই প্রতিহিংসা নয়, অতিহিংসা নয়, পরম অহিংসা। গান্ধীজী তাঁর শেষের পরিচয় দেন। অনশনভঙ্গের পর মৃত্যুবরণ করেন।

মহানগর

রানী সাহেবাকে স্বাগত জানাতেই তিনি একটু হেসে বলেন, "আমি তো এ শহরে বাইরের লোক নই। আপনারা তো জানেন যে রাজস্থানের সবচেয়ে বড় শহর হচ্ছে কলকাতা।"

আমরা চমকে উঠি। "আমাদের ধারণা ছিল জয়পুর।"

"না জয়পুরেও এত বেশী রাজস্থানী নেই।" তিনি কলকাতার রাজস্থানীদের একটা সংখ্যা দেন।

তা যদি হয় তবে পাটনাতেও এত বেশী বিহারী নেই। কটকেও এত বেশী ওড়িয়া নেই। কলকাতা হচ্ছে বিহারের সব চেয়ে বড়ো শহর। ওড়িশারও সব চেয়ে বড়ো শহর। রাজস্থানীরা যদি এখানে বাইরের লোক না হয় ওড়িয়া ও বিহারীরাও তা নয়। আসলে কেউ এখানে বাইরের লোক নয়। কারণ কলকাতা হচ্ছে সারা ভারতের সব চেয়ে বড় শহর।

সেকালের চারটি ধামের মতো একালেও চারটি মহানগর আছে যাদের বলতে পারা যায় সর্বভারতীয়। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লীকে শুধু সর্বভারতীয় কেন, কসমোপলিটান বলতে পারা যায়! সাগরপারের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্যে কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠা। আর দিল্লীর পত্তন যে কারণেই হোক মধ্যযুগে সে ছিল ইরান, মধ্য এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের কেন্দ্র।

ইংরেজরা যে তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে কলকাতাই হয়ে ওঠে প্রথমে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর ও পরে সারা ইংরেজশাসিত ভারতের রাজধানী। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীও গোড়ায় বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত ছিল। কলকাতা শুধুমাত্র বাংলাদেশের রাজধানী হয় মাত্র ষাট বছর আগে ১৯১২ সালে। যে সময় দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কলকাতা শুধুমাত্র বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পঁয়ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। তখন কলকাতা হয় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

এ দেশের তিন হাজার বছরের ইতিহাসে কলকাতার বয়স তিনশো বছরও নয়। তার আগে সারা দেশের রাজধানী কখনো পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কলকাতার এ সৌভাগ্য মাত্র দুই শতক স্থায়ী হয়। সেই সময় পূর্বদিক থেকেই সূর্য ওঠে। সব ব্যাপারে কলকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয়রাই নেতৃত্ব করেন। কলকাতা হয়ে ওঠে কেবল কসমোপলিটান নয়, অধিকন্তু মেট্রোপলিটান। রাজধানী যদিও স্থানান্তরিত হয়েছে, ইউরোপীয়দেরও আর লক্ষ করা যায় না তবু কলকাতা এখনো একাধারে কসমোপলিটান তথা মেট্রোপলিটান। দিল্লী এখনো তার সে মহিমা খর্ব করতে পারেনি।

তা সত্বেও কলকাতা সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। কেন হয়েছে তা বুঝতে হলে দু' হাজার বছর পেছিয়ে যেতে হয়। সিন্ধু সভ্যতার মতো গাঙ্গেয় সভ্যতাও ছিল নদীমাতৃক, কিন্তু ভারতের উভয় প্রান্তেই নদীর সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ ছিল, নয়তো সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্ভব হতো না। সামুদ্রিক বাণিজ্য দক্ষিণের সভ্যতাকেও মহান করেছিল। সাগরপারের সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকার সংযোগস্থল ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। সেটা ছিল গঙ্গার অন্যতম শাখা নদীর মোহনায় অবস্থিত। সারা গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্য সেই পথ দিয়েই পরিচালিত হতো। বিদেশ থেকে জাহাজ আসত, এদেশ থেকে জাহাজ যেত। তাদের মধ্যে যাত্রীজাহাজও ছিল।

তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব নানা কারণে হ্রাস পায়। তার একটি কারণ সারা দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য আরবদের হাতে চলে যায়। সারা ভারত মহাসাগর জুড়েই তাদের একাধিপত্য। তাম্রলিপ্তের চেয়ে চট্টগ্রামই তাদের পছন্দ। আর একটি কারণ গঙ্গার মূল স্রোতটি ভাগীরথী দিয়ে সাগরের সঙ্গে মিলিত না হয়ে পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হয়। যে শাখানদীর কূলে তাম্রলিপ্তের অবস্থান সে নদীর জল কমতে কমতে শুকিয়ে যায়। তাই তাম্রলিপ্তও বাণিজ্যের পক্ষে অযোগ্য হয়ে যায়। অথচ চট্টগ্রাম যে তার স্থান পূরণ করতে সমর্থ হয় তাও নয়। চট্টগ্রাম যদিও জলপথে উত্তরভারতের সঙ্গে সংযুক্ত তবু বড়ো বড়ো জাহাজ সে পথ দিয়েও বেশী দূর যেতে আসতে পারে না। সেরকম একটি বন্দরের অভাব পূরণ করে পরবর্তীকালে কলকাতা।

ভাগীরথী তিনশো বছর আগেও বহতা ছিল। জাহাজ চলাচলের পক্ষে গভীর ছিল। বড়ো বড়ো জাহাজ কলকাতায় মাল খালাস করে দিলে ছোট ছোট জাহাজ সে মাল পাটনায় এলাহাবাদে কানপুরে পৌছে দিত। গত শতাব্দীতেও বারো মাস স্টীমার চলত কলকাতা থেকে উত্তরপশ্চিম মুখে। রেলপথ নির্মিত হওয়ায় স্টীমারের গুরুত্ব হ্রাস পায় সত্য, তবু তার চলাচল বন্ধ

হয়ে যাবার প্রধান কারণ গঙ্গার মূল স্রোত থেকে ভাগীরথী দিয়ে যথেষ্ট জল না আসা। রেলপথ যদি না থাকত তাহলে উত্তর ভারতের বাণিজ্য একেবারেই বঙ্গোপসাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। অপর পক্ষে রেলপথ হওয়ায় উত্তর ভারতের বাণিজ্য আর কেবলমাত্র কলকাতানির্ভর থাকে না। বম্বের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে।

ইতিমধ্যে মোটর গাড়ীর উদ্ভাবন হয়েছে। মোটরযোগ্য পথ নির্মিত হয়েছে! বাণিজ্য শুধু রেলপথনির্ভর নয়। কিন্তু এর ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্য এখন আর বঙ্গোপসাগরকেই অবলম্বন করে পরিচালিত নয়, আরবসাগরের বন্দরগুলিও এখন কলকাতার শরিক। ইতিহাসে আর কখনো এরূপ হয়নি। ওদিকে দেশভাগের ফলে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরও কলকাতার শরিক হয়ে উঠেছে। বিশাখাপত্তনের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের যোগাযোগ ঘটায় মধ্যপ্রদেশ আর কলকাতার দিকে তাকায় না। পারাদ্বীপ গড়ে উঠলে ওড়িশাও কি তাকাবে? কলকাতার হিনটারল্যাণ্ড শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার। হয়তো উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ। আসামকেও তার সঙ্গে জুড়তে পারা যায়।

কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারদের কৌশলে আবার যদি ভাগীরথীকে বারোমাস বহতা করতে পারা যেত তা হলে আবার বারোমাস স্টীমার চালাতে পারা যেত। স্টীমারযোগে মাল পৌঁছত আবার কানপুর। রেলপথ ও মোটর পথের চেয়ে জলপথই সস্তা। কাজেই কলকাতার গুরুত্ব আবার ফিরে আসত। গাঙ্গেয় উপত্যকার সমস্তটাই কলকাতার দিকে তাকাত। যমুনা দিয়ে দিল্লীতেও কলকাতার মাল পৌঁছত। এভাবে চিন্তা করলে ভাগীরথীকে পুনরায় উত্তরভারতের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের যোগসূত্র করার উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়।

কিন্তু চিন্তা যাঁরা করছেন তাঁরা এভাবে চিন্তা করছেন না। তাঁদের সমগ্র চিন্তা জুড়ে রয়েছে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো। বন্দরকে বাঁচানো বলতে তাঁরা বোঝেন উত্তরমুখে স্টীমার পাঠানো নয়, দক্ষিণ দিক থেকে বড়ো বড়ো জাহাজের আসাযাওয়া। অর্থাৎ কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত জলপথকে সমুদ্রাগত জাহাজের পক্ষে যথেষ্ট গভীর ও সম্পূর্ণ নিরাপদ করা। দক্ষিণের প্রয়োজনেই তাঁরা উত্তরের চিন্তা করছেন। উত্তর থেকে চল্লিশ হাজার কিউসেক জল আসবে ও দক্ষিণ থেকে বড়ো বড়ো জাহাজ আসবে। একটি সম্ভব না হলে অপরটি সম্ভব নয়। অতএব ফরাক্কা পরিকল্পনা।

স্বাধীনতার অল্পদিন পরে আমি মুর্শিদাবাদে বদলী হই। প্রথম সুযোগেই

আমি ফরাক্কা দেখতে যাই। তখনো পরিকল্পনার কথা ওঠেনি। ওখানে ছিল একটা থানা। ওটাই ছিল পরিদর্শনীয়। সরকারী কাজের কথা আর মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে গঙ্গার নির্মল স্বচ্ছ ও শীতল সলিলে অবগাহন ও সন্তরণের কথা। গঙ্গা বলেছি, পদ্মা বলিনি। পদ্মা তখনো শুরু হয়নি। ভাগীরথীও না। পরে একদিন ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থলে যাই। দেখে নিরাশ হই। ওইটুকু জল তো বহরমপুরেও পেঁছবে না। কলকাতায় পেঁছবে কী করে? বর্ষাকালে লঞ্চ আনিয়ে নিয়ে আবার ওইখানে দিয়ে পদ্মায় যাই। জল বেড়েছে দেখি, দেখে সুখী হই। কিন্তু জলের তোড় এমন কী বেশী!

আমি অবশ্য মেপে দেখিনি জলের তোড চল্লিশ হাজার কিউসেক কি তার চেয়ে কম বেশী। এই পর্যন্ত আমি জোর করে বলতে পারি যে ওতে উত্তরগামী স্টীমার চলতে পারে। সমুদ্রগামী জাহাজ চলতে পারে কি না সেটা জোর করে বলতে আমি অক্ষম। যাঁরা বলছেন তাঁদের একদিন জবাবদিহির দায়ে পড়তে হবে। সময়ে বর্ষণ না হলে, সময়ে প্লাবন না এলে, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত জল সঞ্চিত না হলে বারো মাস চল্লিশ হাজার কিউসেক সরবরাহ করা সম্ভব কি না সে বিষয়ে আমি সংশয়াম্বিত। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে বহরমপুরের নদীটা বছরে সাত আট মাস শুকনো পড়ে থাকে। পুরো একটা মাসও তাতে লঞ্চ চালানো যায় না।

যাই হোক, ধরেই নেওয়া যাক যে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার দ্বারা সকলই সম্ভব। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, বড়ো বড়ো জাহাজ বলতে কী বোঝায়? স্বদেশী জাহাজ না বিদেশী জাহাজ? যদি বিদেশী জাহাজ বোঝায় তো দমদম বিমানবন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক! পুরোনো বিমান বন্দরে নানা দেশের বিমান আসত যেত। নতুন বিমানবন্দরে তাদের অধিকাংশই অনুপস্থিত। প্রযুক্তি বিদ্যার ত্রুটি নেই। ইঞ্জিনীয়াররা তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন। ইচ্ছা করলে সবাই আসতে পারে, যেতে পারে। তবু আসাযাওয়া করতে অধিকাংশই নারাজ। এর একটা কারণ তো কলকাতা শহরের অনিশ্চিত অবস্থা, আর একটা ভারত সরকারের পলিসি। শুনেছি বিদেশী বিমানকে নাকি দুটোর বেশী বিমানবন্দরে ওঠানামা করতে দেওয়া হবে না। সে দুটো যদি হয় দিল্লী ও বম্বে তবে কলকাতা সহজেই বাদ পড়ে। যদি হয় কলকাতা ও দিল্লী তবে বম্বে বাদ পড়ে যায়। যদি হয় কলকাতা ও বম্বে তবে দিল্লীর বরাতে শূন্য।

আগেকার আমলে কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ তিনটি জাহাজী বন্দরের উপরেই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হতো। পরে করাচীর উপরেও। কার্যত কলকাতা ও বম্বে ছিল প্রধান দুই জাহাজী বন্দর। কিন্তু প্রতিষ্ঠার সময় মাদ্রাজও ছিল প্রধান। এই বন্দরগুলির বিকাশ ও সমৃদ্ধির মূলে ছিল ইংরেজ সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতি। অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ না পেলে কলকাতা কখনো এত বিরাট হতো না। পরবর্তীকালে খোদ ইংলণ্ড তার অবাধ বাণিজ্য নীতি থেকে সরে যায়। ভারতও হয়ে ওঠে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদী। এই যে নীতি পরিবর্তন এটা স্বদেশী শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচানোর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এর ফলে বিদেশীরা বাণিজ্য করতে উৎসাহ পায় না। নিতান্ত দরকারী ছাড়া আর-কিছু তারা কিনতে চায় না। যদি না বিনিময়ের দিক থেকে সুবিধে হয়।

জাহাজ যারা পাঠায় তারা খালি জাহাজ পাঠায় না, বোঝাই জাহাজ পাঠায়। সে জাহাজ খালি ফিরে গেলেও পোষায় না। বোঝাই ফিরে গেলেই পোষায। আমদানী ও রফতানীর হিসাবে কোনো পক্ষই ঠকতে চায় না। একতরফা লোকসান দিতে চায় না। যারা একতরফা লোকসান দিতে বাধ্য হয় তারা আমদানী গুটিয়ে নেয়। যে কারণেই হোক ইংলণ্ড এখন কমনওয়েলথের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কমন মার্কেটের দিকে ঝুঁকেছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মিলে যে কমন মার্কেট গড়ে তুলছে তাতেই ইংলণ্ডের লাভ বেশী। শোনা যাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ অতঃপর অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্র হবে। সেইটেই নাকি হবে তাদের পক্ষে অধিকতর সমৃদ্ধিকর।

যাদের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্য তারা যদি বাণিজ্য করে লাভবান না হয় তবে তো বিদেশী জাহাজের যাতায়াত আপনি কমে যায়। চল্লিশ হাজার কিউসেক গঙ্গার জল পাওয়া গেলে তাদের আসা-যাওয়া সুগম হতে পারে, কিন্তু বাণিজ্য যাদি লাভজনক না হয় তা হলে শুধুমাত্র সুগম নদীপথের জন্যেই কি তারা আসবে ও যাবে? এখন দমদমের নতুন বিমানবন্দরকে চালু রাখবার জন্যে যেমন এয়ার ইণ্ডিয়াকে বিমান পাঠাতে হচ্ছে তেমনি চল্লিশ হাজার কিউসেকের সদ্ব্যবহারের জন্যে ইণ্ডিয়ান শিপিং করপোরেশনকে জাহাজ পাঠাতে হবে। বিদেশী জাহাজ মাঝে মাঝে দুটো একটা আসবে। কিন্তু অহরহ নয়। ঝাঁকে ঝাঁকেও নয়।

বছর কয়েক আগেও আমি কলকাতায় অগণিত জাহাজ লক্ষ করেছি। এখন আর দেখতে পাইনে। সবটাই কি নদীর নাব্যতার অভাবে? না নীতিগত পরিবর্তনে? না কলকাতার অনিশ্চিত অবস্থার দরুন? আজ ধর্মঘট, কাল বন্ধ, পরশু খুনোখুনি, এই যেখানকার নিত্যনিয়ম সেখানে বিমানযাত্রীরা তো নামতে ভয় পাবেই, জাহাজীরাও মাল নামাতে ওঠাতে কুণ্ঠিত হবে। দুনিয়ার সব জায়গায় কলকাতার নামে আজকাল লোকে শিউরে ওঠে। তাই তার পাশ কাটাতে চায়।

বন্দরের হাল কী হবে তা বলা কঠিন। কারণ ঐতিহাসিক গাঙ্গেয় উপত্যকা এখন রেলপথ ও মোটরপথ দিয়ে আরব সাগরের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে গঙ্গা থেকে খাল কেটে নিয়ে কাবেরীর সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হবে। সেইভাবে কলকাতাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে বন্দরের হাল যাই হোক শহরটা থাকবেই। থাকবে উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে, সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে। কলকাতায় ও তার আশেপাশে বিভিন্ন ও বিচিত্র কলকারখানা ও শিল্পশালা। এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কারণ নেই। তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশাল সত্র। এর উপরেও আস্থা রাখতে পারা যায়।

গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গ পাকিস্তানের সামিল না হয়ে ভারতের সামিল হয়। সে সম্পর্ক চিরদিন থাকবে। উত্তর ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা কেউ কোনো দিন ভাববে না। এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইংলণ্ড তথা ইউরোপের সঙ্গে গভীরতর যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকবে কি না সে বিষয়ে আমি অতটা নিশ্চিত নই। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসবে। ইউরোপীয় শাসকরা আর নেই। মিশনারীরাও প্রায় অদৃশ্য। বণিকরাও ক্রমে বিদায় নিচ্ছেন। তাঁদের কারবার ভারতীয়রা কিনে নিচ্ছে কিংবা সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। বছর দশেক বাদে যাদের দেখতে পাওয়া যাবে তারা প্রধানত পর্যটক বা গবেষক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনতীর্থরূপে কলকাতার যে ভূমিকা ছিল সেটা বোধ হয় আর বেশী দিন থাকবে না। ইংরেজীচর্চা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাট চুকে যাবে।

তবে পূর্ব দিকের দুয়ার খুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের জলপথ ও স্থলপথ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে

আসবে। কলকাতা হবে পূর্ব ভারতের মিলনকেন্দ্র। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগসূত্র। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সঙ্গে সদ্ভাব কি কোনো দিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না? যখন হবে তখন দেখা যাবে যে, কলকাতা হয়েছে চীন তথা তিব্বতের সঙ্গে আদান-প্রদানের সেতু। সম্পর্কের উন্নতি হলে কলকাতার বিমানবন্দর ওই জন্যেই পুনর্বার প্রাণ পাবে। কলকাতার বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ হবে। পৃথিবীর সব ক'টি দেশই চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হতে চায়। দুটি দেশ বাদে। তারা আমেরিকা আর ভারত। আমেরিকার মত বদলেছে। ভারতের মতও একদিন বদলাবে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে। তখন কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে যাবে, কারণ সমুদ্রপথে চীন বহু দূর। আকাশপথে বা স্থলপথে তত দূর নয়।

চীনের বর্তমান মনোভাব যতই নৈরাশ্যকর হোক না কেন আমরা যেন মনে রাখি যে, হিমালয়ের এপারে আর ওপারে পৃথিবীর দুটি প্রাচীনতম ও বৃহত্তম দেশের অস্তিত্ব। কলকাতা একদা মহাসাগরের এপারের সঙ্গে ওপারকে মিলিয়েছিল। একদিন হিমালয়ের এপারের সঙ্গে ওপারকেও মেলাতে পারে। আমার তো মনে হয় ভারতকে রাশিয়ার সঙ্গে মেলাবার ভার দিল্লীর উপরে। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে মেলাবার ভার বম্বের উপরে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে, মালয়েশিয়ার সঙ্গে মেলাবার ভার মাদ্রাজের উপরে। চীনের সঙ্গে জাপানের সঙ্গে, ইন্দোচীনের সঙ্গে, মেলাবার ভার কলকাতার উপরে। তা ছাড়া করাচী যদিও ভারতের অঙ্গ নয়, তবু তার উপরে ভার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানকে মেলাবার।

কলকাতার গুরুত্ব থাকবেই। যদিও সে গরিমা আর ফিরবে না যার সাক্ষী ঊনবিংশ শতাব্দী। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তখন পাঁচ আঙুলের মতো এক হাতে বিন্যস্ত হয়েছিল। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোনো একটি নগরী একাধারে এতগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থানীয় হয়নি। এর জন্যে বাঙালী যেমন গৌরব বোধ করতে পারে অবাঙালীও তেমনি। ভারতীয় যেমন গৌরব বোধ করতে পারে অভারতীয়ও তেমনি। যেটা সকলের মিলিত কীর্তি সেটাকে শুধুমাত্র বাঙালীর বলে দাবী করাটা ভুল। তবে কলকাতা যখন বাংলাদেশে অবস্থিত তখন বাঙালীর পক্ষেই সর্বাধিক গৌরবজনক।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বিংশ শতাব্দীতে দিল্লী দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে। বম্বেও পেছিয়ে নেই। বিস্তর বাঙালী

দিল্লীতে গিয়ে বসবাস করছেন। বম্বের ফিল্ম ব্যবসা তো বাঙালীতে ভরে যাচ্ছে। কলকাতায় যদি সুযোগ থাকত এঁরা দিল্লী বা বম্বে যেতেন কেন? সে সুযোগ সৃষ্টি করাও সহজসাধ্য নয়। হাজার চেষ্টা করলেও বাংলা ফিল্ম হিন্দী ফিল্মের মতো অর্থকরী হতে পারবে না। দিল্লীতে ভারত সরকার যত বেশী চাকরি দিতে পারবেন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তত বেশী চাকরি দিতে পারবেন না। তত বড়ো তো নয়ই। এই যে "ব্রেন ড্রেন" এটা অব্যাহত থাকবেই। এমন কি বেড়ে যেতেও পারে। যদি না শিল্পের উপর বাণিজ্যের উপর আরো বেশী জোর দেওয়া হয়। শিক্ষাকেও তার উপযোগী করে তোলা চাই। শিক্ষা যদি হয় চাকরির জন্যে তবে দিল্লীই হবে তার মক্কা, সেখানেই সবাই ছুটবে হজ করতে।

কেবলমাত্র সংস্কৃতি নিয়ে একটা শহর বা একটা রাজ্য বড়ো হতে পারে না। লণ্ডন বলো, প্যারিস বলো, বার্লিন বলো, মস্কো বলো কোনোটাই সংস্কৃতির একপায়ে তালগাছের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি। প্রাচীন ভারতের কাশী, মথুরা, পাটলীপুত্রও শিল্প বাণিজ্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদও তাই। আমরা যেন সংস্কৃতির গর্বে দিশাহারা না হই। আর এই সংস্কৃতির কতটুকুই বা থাকবে যখন পশ্চিমের সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে? অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতটুকুই বা ছিল? সেটুকু ভারতের অপরাপর রাজ্যে বা প্রদেশেও ছিল। কলকাতা বলে একটি সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর প্রতিষ্ঠিত না হলে, বন্দর ক্রমে ক্রমে নগর না হয়ে উঠলে, নগর একদিন বাংলার রাজধানী না হলে, বাংলার রাজধানী পরে ভারত সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যধানী না হলে, সেখানে নতুন আদর্শের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হলে আমরা যা নিয়ে গর্বিত তার সামান্যই থাকত। বাঙালীর ইতিহাসে ওটা একটা বৃহৎ অগ্রগামী উল্লম্ফন।

গত মন্বন্তরের সময় আমি লক্ষ করেছি যে, কলকাতার লোক যে-কোনো মূল্যে গ্রাম থেকে চাল কিনে আনার ফলে গ্রামের লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল। হঠাৎ হু হু করে দাম বেড়ে না গেলে তারা বোকার মতো চাল বেচে দিত না, পরে নিজেরাই বেশী দাম দিয়ে কিনতে না পেরে অনশনে মরত না। রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে আবার মন্বন্তর হবে। রেশনেও কলকাতার লোকের কুলায় না বলে গ্রাম থেকে চোরা পথ দিয়ে চাল আসে। ফলে গ্রামের লোক আধপেটা খেয়ে বাঁচে। রেশনব্যবস্থা চিরকাল বহাল রাখাও অনুচিত। হয় শহর

থেকে লোক সরাতে হবে, নয় খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। যাতে গ্রামে ও শহরে সবাই পেট ভরে খেতে পায়। খাদ্যের পেছনে যে খরচটা হয় সেটাও কমানো দরকার। নইলে লোকের হাতে আর-কিছু কেনার জন্যে টাকা থাকবে না। যাকে আমি আর কিছু বলছি তারই উপরে নির্ভর করে সভ্যতা। অধিকাংশ মানুষ সেই আর কিছুর থেকে বঞ্চিত থাকলে সভ্যতা নিবদ্ধ হয় অল্পসংখ্যক বিত্তবানদের মধ্যে। সেটা তো কাম্য নয়। সভ্যতাকে করতে হবে সর্বসাধারণের লভ্য। তা হলে খাদ্যকে করতে হয় পর্যাপ্ত ও সুলভ।

ইংলণ্ড এই সমস্যার সমাধান করেছিল বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করে ও কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য বাইরে চালান দিয়ে। সে অর্থনীতি আমাদের উপযোগী নয়। দেশের খাদ্য দেশেই উৎপাদন করতে হবে। নইলে বৈদেশিক মুদ্রার সবটাই খাদ্যের আমদানীতে খরচ হয়ে যাবে। এত দিনে কর্তাদের হুঁশ হয়েছে। খাদ্য যতদিন না পর্যাপ্ত ও সুলভ হয় ও সকলের ভাগে পড়ে ততদিন শিল্পায়নও ,ঠিকমত চলবে না। ফাঁপা টাকায় লোকের পেট ভরবে না। লোকে ধর্মঘট করবে। শহরের জীবন দুর্বহ হবে। শহরকে বাঁচাতে হলে চাষকেও বাঁচানো দরকার। কলকাতাকে খাওয়ানোর দায় নিতে হবে গোটা চার পাঁচ রাজ্যকে। এ হাতীর খোরাক জোগানো একা পশ্চিমবঙ্গের সাধ্য নয়।

শহরের শিল্পায়ন যে গ্রামের শিল্পকে ধ্বংস করে তার বিস্তর প্রমাণ মিলবে দেশে বিদেশে। তাই কেবল চাষকে বাঁচালেই কাজ ফুরোবে না, গ্রাম্য শিল্পকেও বাঁচাতে হবে। কৃষির পর গ্রাম্য শিল্পই সব চেয়ে বেশী লোককে জীবিকা জোগায়। কোটি কোটি মানুষকে তাদের জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত করে নাগরিক সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন সার্থক হতে পারে না। আমরা চাই শহর ও গ্রামের, কৃষি ও শিল্পের, যন্ত্রশিল্প ও কারু শিল্পের সুষম বিকাশ; সেই জন্যে আমাদের মন্ত্র হবে "বাঁচো আর বাঁচতে দাও।"

আদার ব্যাপারী ও জাহাজের খবর

"তুমি তো আদার ব্যাপারী। তোমার জাহাজের খবরে কাজ কী ?" এই প্রশ্নের ভয়ে আমি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে লিখিনে। কিন্তু আদার দাম যদি বেড়ে যায়, আমার খোরাকে যদি টান পড়ে তা হলে জাহাজের খবর নিতে বাধ্য হই। অনেক দিন মুখ বুজে সহ্য করেছি। আর পারছিনে। আজ থেকে পেট্রল ও কেরোসিনের দাম গেল বেড়ে। কেন এই দুর্ভোগ ? লোকে যখন জানতে চাইবে তখন দেশের বুদ্ধিজীবীদেরও এর জবাব দিতে হবে।

গত দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলির নিবিড় সম্পর্ক। কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ গড়ে উঠেছে আমদানী রপ্তানীর দৌলতে। এই শহরগুলিকেই কেন্দ্র করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খবরের কাগজ মাসিকপত্র ছাপাখানা বইয়ের ব্যবসা থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতির সূত্রপাত ও বিস্তার হয়েছে। এই সম্পর্কটা যাতে আমাদের পক্ষে অপমানকর বা ক্ষতিকর না হয় তার জন্যে আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছি যে, সম্পর্কটা যদি একেবারে কেটে যায় তা হলে আমরা আবার মধ্যযুগে ফিরে যাব। আবার কূপমণ্ডূক হব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব মনীষী একমত যে আমরা আধুনিক যুগে বাস করতে চাই, আধুনিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই, অতীতে ফিরতে চাইনে, ঘরকুনো হতে চাইনে। স্বদেশকে ভালোবাসি। সেই সঙ্গে স্বযুগকেও।

রামমোহনকে ইউরোপে যেতে হয়েছিল আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান। তিনি যান আফ্রিকা ও এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত সুয়েজ যোজক ভেদ করে সুয়েজ খাল দিয়ে। তাতে সময়ও বাঁচে, খরচও বাঁচে। ওই সংক্ষিপ্ত জলপথ আমাকেও চোদ্দ দিনে ইউরোপে নিয়ে যায় ও ভারতে নিয়ে আসে। খরচ যা পড়ে, তা আজকের তুলনায় অনেক কম। আমদানী রপ্তানীর দিক থেকেও অশেষ সুবিধে। লাভটা যে শুধু ইউরোপীয়দেরই হতো তা নয়, ভারতীয়দেরও হতো। কত সস্তায় আমরা বই কাগজ পেতুম। আর কত কম সময়ে। এখন [illegible] হয়ে [illegible]। [illegible] দিক থেকে সুবিধে হয়েছে, কিন্তু সবদিক থেকে নয়। অধিকাংশ ক্ষ

কাগজ ডাকেই আসা-যাওয়া করে। মালপত্রের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত। যাত্রীরা বিমানে যাতায়াত করলেও তাঁদের মাল পাঠিয়ে দেন জাহাজে করে। তা ছাড়া এখনো বিস্তর যাত্রী বিমানের বদলে জাহাজই পছন্দ করেন। তাঁদের হাতে সময় বেশী, পাথেয় কম।

শতখানেক বছর ধরে সুয়েজ খাল হয়ে উঠেছিল আমাদের জীবনের অঙ্গ। সে খাল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আবার আমাদের ফিরে যেতে হয় রামমোহনের যুগে। জাহাজগুলো আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরে যাওয়া আসা করে। আমদানী খরচ বেড়ে যায়। সময়ও লাগে অনেক। বিলেত থেকে আমার নামে যে পত্রিকা এক পক্ষ কালের মধ্যে পৌঁছত আর সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসত সে হয়তো তিন মাস পরে আসে এক সঙ্গে তিন চার সংখ্যা। মেল স্টীমার বলে যেন কোনো পদার্থই নেই। আর তার ডাকমাশুলও চড়েছে। এখন আমাকে তিন পাউণ্ডের জায়গায় দিতে হয় সাড়ে আট পাউণ্ড। তাও পাউণ্ডের দেড়া দামে। ইউরোপের মনোজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। হাওয়াই ডাকের সাহায্য নিলে সময় নিশ্চয় বাঁচত, কিন্তু খরচও নিশ্চয় বাড়ত। কোথায় পাই?

বুদ্ধিজীবীদের সম্বল অপরিমিত নয়। কোনো মতে বেঁচে বর্তে থাকতেই যে খরচাটা হয় তার উপরে সংস্কৃতির জন্যে বাড়তি খরচ আমাদের অধিকাংশেরই সাধ্যাতীত। পত্রিকার উল্লেখ করেছি। পুস্তকের বেলাও একই কথা। বই একটু দেরিতে পৌঁছলেও অত সহজে বাসি হয়ে যায় না, কিন্তু তার দামও বেশী, সংখ্যাও কম। এর পরিণাম নতুন এক অন্ধকার যুগ। যাদের হাতে আছে টাকা তারা পড়াশুনা করে না। যারা পড়াশুনা করে তাদের পকেট খালি। ছেলেবেলায় আমরা এক শিলিং দামের ওয়ার্লডস ক্লাসিক পড়েছি, এভরিম্যানস লাইব্রেরীর অমর গ্রন্থ পড়েছি। বারো আনায় শিলিং। সে ছিল এক স্বর্ণ যুগ। ভাবীকালের বুদ্ধিজীবীরা মানুষ হচ্ছে কী পড়ে?

এখন ওই সুয়েজ খালের ব্যাপারটায় ফিরে আসি। ওটা যে এত দীর্ঘকাল গড়াবে, পৃথিবীর লোক গড়াতে দেবে সেটা আমার বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলুম এক বছর কি দু'বছর। এতে যে কেবল আমাদের ক্ষতি হচ্ছে তা তো নয়। ক্ষতি হচ্ছে ইউরোপীয়দেরও। তারা কি বুঝতে পারছে না তারা কী হারাচ্ছে? কিন্তু কোনো দেশই পাঁচ সাত বছরে তার চিরাচরিত পলিসি

পালটাতে পারে না। ভারতকে স্বরাজ দেওয়া নিয়েও ইংরেজ ত্রিশ বছর গড়িমসি করেছে। তার পরেও ব্যালান্স অফ পাওয়ারের খাতিরে দুভাগ করেছে। সুয়েজ সম্বন্ধেও তেমনি এক গড়িমসি চলেছে। চলেছে আর কোথায়! অচল হয়েছে।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশের মধ্যবর্তী হচ্ছে সুয়েজ অঞ্চল। আর ওই যে খালটি ওটি হচ্ছে জিব্রলটার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শৃঙ্খলের কেন্দ্রবর্তী অঙ্গ। পৃথিবীতে ওর চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল আর নেই। আমাদের ছেলেবেলায় ওটা ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সামিল। তুরস্কের পরাজয়ের পর তার উত্তরাধিকার নামে বর্তায় আরবদের বিভিন্ন রাজ্যের উপরে, কিন্তু কর্যত ইংরেজ ও ফরাসীর উপরে। সুয়েজ খালের মালিকানার অধিকাংশ ছিল ওদেরি আয়ত্তে। মিশর ছিল সাক্ষীগোপাল। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যে ওরা লীগ অফ নেশনসের ছত্রতলে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট আদায় করে নেয়। সে অঞ্চলে আর কোনো শক্তিকে ঘেঁষতে দেয় না। তুরস্ক তো নিপাতিত। আরবরাও যে একত্র হয়ে একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এটাও তাদের ইচ্ছা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনসও গেল, ম্যাণ্ডেটও গেল, ইংরেজ ও ফরাসীর শক্তি হ্রাসও হলো। পরিবর্তিত অবস্থায় তারা ওই অঞ্চল ছেড়ে বিদায় নিল। কিন্তু সিরিয়া হলো দু'ভাগ। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল লেবানন। প্যালেস্টাইন হলো দু'ভাগ। একভাগের নাম হলো ইসরায়েল। অপরভাগ চলে গেল জর্ডানের মধ্যে। এ ছাড়া কিছু অংশ পেয়ে গেল মিশর।

কিন্তু এহো বাহ্য। ভিতরে ভিতরে যেটা ঘটে গেল সেটা হলো ইংরেজ ও ফরাসীর শূন্যতা পূরণের জন্যে ইসরায়েল তথা আমেরিকার উদয়। আরবরা সেটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করল না। তাদের ইচ্ছা তারাই শূন্যতা পূরণ করবে। কিন্তু তারা দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত। তাদের অধিকাংশই সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত। আরবদের একরাষ্ট্রে আনার স্বপ্ন সাতশো বছর আগে ভেঙে যায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পড়ে তুর্কদের ছত্রছায়ায়। সব মুসলমান ভাই ভাই বলে হাই তুলে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে দেয়। তার পরে হয় ইংরেজ ও ফরাসী চক্রান্তের শিকার! সেই নেপোলিয়নের আমল থেকে। স্বাধীন যদি বা হলো তবে বলকানের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে। নতুন করে স্বপ্ন দেখলেন মিশরের মহান নেতা নাসের। আরবদের তিনি চাইলেন

একসূত্রে গাঁথতে। কিন্তু সিরিয়া ও মিশরকে এক রাষ্ট্রে আনতে গিয়ে তাঁর যে শিক্ষা হয় তাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। এক এক রাজ্যের বিবর্তন এক এক ভাবে হয়েছে। সবাই আরবী ভাষায় কথা বললেও, প্রায় সবাই ধর্মে মুসলমান হলেও আরবরা আসলে সিরিয়ায় লেবাননে মিশরে লিবিয়ায় টিউনিসে আলজেরিয়ায় মরক্কোতে বহিরাগত। জর্ডনও অতীতে সিরিয়ার অন্তর্গত ছিল। প্যালেস্টাইনও তাই। ভাষা ও ধর্মের চেয়ে আরো গভীর এক স্তর আছে, সেখানে তারা এক নয়। তা ছাড়া তাদের সকলের রাজধানী হতে পারে এমন কোনো কেন্দ্রীয় স্থান নেই। কায়রোর প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদ, দামাস্কাস, জেরুজালেম। প্রত্যেকটিই ঐতিহ্যপূর্ণ। তবে কায়রোই সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ সুয়েজের সন্নিকটে।

এক কথায় বলা যেতে পারে সুয়েজ যার কন্ট্রোলে আরব জগৎ তারই কন্ট্রোলে। শুধু আরব জগৎ নয়, পশ্চিম এশিয়াও তারই কন্ট্রোলে। নাসের এটা ভালো করেই বুঝতেন, তাই সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করে ইংরেজ ও ফরাসীদের বিতাড়ন করেন। তাঁরাও তেড়ে আসে ইসরায়েলকে সঙ্গী করে। সে যুদ্ধ থেমে যায় রাশিয়ার হুমকিতে ও আমেরিকার হুঁশিয়ারিতে। তখন থেকে রাশিয়ার প্রভাব ক্রমে বাড়তে থাকে। আমেরিকাও তার সঙ্গে ভারসাম্য রাখার জন্যে ইসরায়েলকে মদত জোগায়। কিংবা বলা যেতে পারে ইসরায়েল তথা আমেরিকার উদয় রাশিয়ার উদয়কে অবশ্যম্ভাবী করে। সুয়েজ যদি পৃথিবীর সব চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল হয়ে থাকে তবে সেখানে ইংরেজ ও ফরাসীর উত্তরাধিকারী হতে চাইবে আমেরিকা ও রাশিয়া, দুই সুপার-পাওয়ার। ইসরায়েল তাদের এক পক্ষের প্রতিভূ, কিন্তু অপরপক্ষের প্রতিভূ কে হবে সেটা এখনো তত পরিষ্কার নয়। বোধহয় মিশর। সুয়েজ জলপথের মালিক। মিশর সিরিয়ার মতো বামপন্থী নয়। আবার জর্ডানের মতো দক্ষিণপন্থীও নয়। মিশর মোটামুটি মধ্যপন্থী। সে রাশিয়ার সাহায্য নিলেও তার সঙ্গে এক শিবিরভুক্ত হতে নারাজ। আরব জগতে সিরিয়া, ইরাক ও আলজেরিয়া এই তিনটি দেশ বামপন্থীদের দ্বারা শাসিত, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তবে এরাও রুশ শিবিরভুক্ত হতে কুণ্ঠিত। কারণ বিপৎকালে রাশিয়া এদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। মাঝখানে তুরস্ক ও ইরান বা ভূমধ্যসাগর।

গতবারের যুদ্ধে ইসরায়েল বাহিনী ছ' দিনের মধ্যে সুয়েজ খালের

পূর্বদিকের দখল নেয়। এবারকার যুদ্ধে মিশর তাদের পূর্বদিকে পিছু হাটতে বাধ্য করে, কিন্তু সতেরো দিন বাদে দেখা গেল তারা পশ্চিমদিকের খানিকটে জুড়ে বসেছে। যুদ্ধ এখন বন্ধ কিন্তু যদি আবার বাধে তা হলে তারা সেটাকে সোপান হিসাবে ব্যবহার করবে। তাই ছাড়তে অনিচ্ছুক। যুদ্ধ যদি না বাধে তবে সেটাকে ওরা দর কষাকষির বেলা কাজে লাগায়। সন্ধি না হলে সুয়েজখাল অবিলম্বে খুলছে না। কে জানে আবার ক'বছর দেরি হবে!

তবে এবার বোধ হয় তেমনি দেরি হবে না। এবার আরবরা সবাই মিলে নতুন একটা হাতিয়ার প্রয়োগ করছে। তারা যদি পেট্রোল বন্ধ করে দেয় তবে ইসরায়েল যে শিবিরের তার কলকারখানা রেল-স্টীমার-মোটর প্রভৃতির দম ফুরিয়ে আসবে। এখনো তারা পুরোপুরি বন্ধ করেনি। যেটুকু করেছে তারই ঠেলায় সকলে তটস্থ। আরব শিবিরে যদি ভাঙন না ধরে, যদি কেউ বেঁকে না বসে তবে এ হাতিয়ারেও কার্যোদ্ধার হতে পারে। যাদের অর্থব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা সবাই মিলে ইসরায়েলের উপর তথা আমেরিকার উপর চাপ দেবে। চাপ পড়লে কি ওরা ওদের বেসিক পলিসি বদলাবে? সুয়েজ অঞ্চল বলতে বেশ অনেকখানি জায়গা বোঝায়। তার মধ্যে পড়ে ইসরায়েল ও তার দ্বারা অধিকৃত ভূমি। সিনাই, গাজা, গোলান হাইটস, জেরুজালেম শহরের আরব এলাকা। চাপ কত প্রবল হলে কেউ এতে রাজী হবে? কিন্তু হয় যদি তবে আর যুদ্ধ বাধাতে হবে না।

এই তৈলসংগ্রাম একপ্রকার অহিংস সংগ্রাম। আমরা যারা এদেশে অহিংস সংগ্রাম দেখেছি তারা এর পরিচালনা প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। বহুধা বিভক্ত দুর্বল পশ্চাৎপদ আরবদের প্রতি যাঁরা অনুকম্পা অনুভব করতেন তাঁরা এবার তাঁদের মত পরিবর্তন করবেন। ওরা যে একমত হয়ে একটা কিছু করতে পারে এইটেই আমার আনন্দের কারণ। সতেরো বছর আগে আমার আরব বন্ধুদের আমি ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছিলুম। ইসরায়েল এসেছে আরবদের ঐক্য শিক্ষা দিতে। ওরা যদি এক হতে শেখে ইসরায়েলও শিখবে কেমন করে আরবদের সঙ্গে কারবার করতে হয়। আর সেটা যেদিন তাদের মর্মে প্রবেশ করবে সেদিন প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত আরবদের সঙ্গেও মিটমাটের সূত্র পাওয়া যাবে। তারা চায় যে যার ঘরবাড়ীতে ফিরে যেতে। তাদের দাবী মেটাতে গেলে ইসরায়েলকে আরো একটা মূলনীতি বদলাতে হয়। ইসরায়েলের সৃষ্টি ইহুদীদের জন্যে। সেদেশে আরবরা যদি

আদৌ ঠাঁই পায় তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে কি তারা সহজে রাজী হবে? ইসরায়েলের বাইরে নতুন এক প্যালেস্টাইন রাজ্য আরবদের সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা সন্দেহ। ইসরায়েলীরা সেটাও হতে দেবে কি না বলা শক্ত।

তবে এই সঙ্কট যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, কী হবে অনুমান করা কঠিন নয়। ইতিমধ্যেই তার সূচনা লক্ষিত হচ্ছে। রুশ মার্কিণ সমঝোতা। ওই দুই সুপার-পাওয়ার পশ্চিম এশিয়া নিয়ে মারামারি করতে চায় না। ভাগাভাগি করতে চায়। অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, পরোক্ষে। কোন্‌টা কার প্রভাবের ক্ষেত্র সে বিষয়ে তারা ভিতরে ভিতরে একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে যাবে। একপক্ষ অপরপক্ষের প্রভাবের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করবে না বলে অঙ্গীকার করলেই চুক্তিটা পাকা হবে। এখন কথা হচ্ছে প্রভাবের ক্ষেত্র কোনটা কার? সুয়েজের মতো দুনিয়ার সেরা স্ট্রাটেজিক স্থান কার প্রভাবের ক্ষেত্র হবে? সুয়েজ খালটা কার প্রভাবাধীন হবে? মিশর নিজে কার দিকে বেশী ঝুঁকবে? খালটা যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন কারো প্রভাবের কোনো মূল্য নেই। যখন চালু হবে তখন দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যদি না তার আগেই একটা বোঝাপড়া হয়।

কোন বৈদেশিক শক্তির প্রভাবাধীন নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এটাই হচ্ছে আদর্শ। এই আদর্শ সামনে রেখে নাসের সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক ঈর্ষা ও চক্রান্ত তাঁকে চালমাৎ করে। খালটিকে তিনি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এখন সে খাল খুলতে চাইলে মিশরকে প্রচুর দণ্ড দিতে হয়। সব দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাতে মিশরের হাতের মুঠো শক্ত হবে না দুর্বল হবে কে জানে?

এতক্ষণ আমি সমস্ত ব্যাপারটা সুয়েজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি। কিন্তু আরো একটা দৃষ্টিকোণ আছে। ইহুদীদের বদ্ধমূল বিশ্বাস প্যালেস্টাইন তাদের সনাতন বাসভূমি। সেখানে ফিরে যাবার অধিকার তাদের ইহুদী হয়ে জন্মানোর জন্মস্বত্ব। জাতিতে ইহুদী হলেই প্যালেস্টাইনের ন্যাশনাল হওয়া যায়। দু' হাজার বছর বাইরে ঘুরে বেড়ালেও এর ব্যত্যয় নেই। অপরপক্ষে আরবদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে প্যালেস্টাইন আরবজাতির ঐতিহাসিক বাসভূমির সামিল। সেখানে তারা প্রায় বারশো বছর ধরে বাস করে এসেছে। অ্যাংলো-স্যাকসনরা যতকাল ইংলণ্ডে বাস করেছে আরবরা ততকাল প্যালেস্টাইনে। হঠাৎ একদল কেলটিক যদি আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসে হাজির

হয় আর কর্নওয়াল থেকে অ্যাংলো স্যাকসনদের হটিয়ে দেয় তা হলে ইংরেজরা কি কর্নওয়ালের উপর দাবী মেনে নিয়ে নিজেদের দাবী ছেড়ে দেবে?

ইহুদীদের যুক্তি মেনে নিলে কেলটিকদেব যুক্তিও মেনে নিতে হয়। কেলটিকদের যুক্তিও মেনে নিলে রেড ইণ্ডিয়ানদের দাবীও মেনে নিতে হয়। আমেরিকার সর্বত্র ছিল ওদের আদি বাসভূমি। তাহলে ন্যায়ের অনুরোধে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের ফিরে আসতে হয় ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, পর্টুগালে ও স্পেনে। রেড ইণ্ডিয়ানদের গায়ের জোর নেই, এই যা তফাৎ। গত শতাব্দী অবধি ইহুদীদেরও গায়ের জোর ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ন তাদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমান অধিকার দিয়ে যান। যাকে বলে ইহুদীদের এমানসিপেশন। তারা সৈন্যদলেও প্রবেশ পায়। ফ্রান্সের অনুকরণে অপরাপর দেশেও কনসক্রিপশন প্রবর্তিত হয়। ইহুদীদেরও কনসক্রিপট করা হয়। সেনাবিভাগে তাদেরও পদোন্নতি হয়। অবশ্য তার জন্যে তাদের হিংসাও করা হয়। ড্রেফুর উপর যে অন্যায় করা হয় তার জন্য ফ্রান্সের জনমত উত্তাল হয়। পরে সে অন্যায়ের প্রতিকারও হয়।

ইউরোপের ইহুদীরা দেড়শ বছর ধরে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিভাগে তারা ইউরোপীয়দের সমকক্ষ। তারাও ইউরোপীয়। তারা না জানে এমন বিদ্যা নেই। আরবরা তাদের তুলনায় অর্ধশিক্ষিত ও অর্ধ আধুনিক। সংখ্যায় অধিক হলে কী হবে, অভিজ্ঞতায় অসমকক্ষ। ইসরায়েল হচ্ছে ইউরোপেরই একটি প্রত্যঙ্গ। সমুদ্রের এপারে ওপারে একই রকম শিক্ষাদীক্ষা কায়দাকানুন অভিজ্ঞতা। ইসরায়েল হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার জাপান।

ইহুদীরা পুরুষানুক্রমে তাদের আদি বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখে এসেছে, অথচ সেই রোমান আমল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে মনে প্রাণে ইউরোপীয় বনে গেছে। সদর ছেড়ে মফঃস্বলে যেতে কে চায়! শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে কে চায়! সত্যি সত্যি ফিরে যাবার কথা যারা ভাবত তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বেশীর ভাগই চাইত ইউরোপের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে। সেখানে আশা না দেখলে আমেরিকায় পাড়ি দিত ও রাতারাতি উন্নতি করত। এখনো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে ষাট লাখ ইহুদী। আর খোদ ইসরায়েলে ত্রিশ লাখের মতো। এদের শতকরা তেত্রিশ জন ইউরোপীয়, বাদ বাকী ওরিয়েন্টাল। অর্থাৎ এশিয়া ও

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। ইউরোপ প্রত্যাগতরাই উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত। তারাই সর্বঘটে।

ইহুদীরা যখন প্রথম ইউরোপে যায় তখনো সেখানে খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তন হয়নি। তারা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পায়। পরে যখন ইউরোপের লোক খ্রীস্টান হয়ে যায় তখন ইহুদীদের সম্বন্ধে ওদের দুই বিপরীত ধারণা জন্মায়। তারা এব্রাহীম, মোজেস প্রভৃতি প্রোফেটের বংশধর বলে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেণ্ট অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাদের হিব্রু ভাষার নামগুলিই খ্রীস্টান পুত্রকন্যার উপযুক্ত নাম। যেমন জন বা মেরী। অথচ ওরা যে পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র ত্রাণকর্তা যীশুকে অসীম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে বা করিয়েছে এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। দুই বিপরীত ধারণার দরুণ ইহুদীরা কখনো হয়েছে নির্যাতিত কখনও সমাদৃত। যত নষ্টের গোড়া ইহুদী। মার্কস না হলে আইনস্টাইন না হলে ফ্রয়েড না হলে আধুনিক ইউরোপ কার কাছে প্রেরণা পেত? সঙ্গীতে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নৃত্যে নাট্যাভিনয়ে ওদের বাদ দিলে আলো নিভে যায়, রস শুকিয়ে যায়। *হিটলার ওদের ধ্বংস করতে গিয়ে* মধ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে বঞ্চিত করে দিয়ে গেছেন।

ইউরোপীয় মানস এখন অপরাধবোধে জর্জর। ইহুদীদের জন্যে খ্রীস্টানরা এখন যেমন করে পারে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। "আহা বেচারিরা নিরাপদে বাস করার জন্যে এক টুকরো জমি পেলে বর্তে যায়। দাও না কেন ওদের প্যালেস্টাইনের একাংশ। আরবদের কত আছে। ওটুকু হাতছাড়া হলে এমন কী ক্ষতি হবে? ক্ষতি হলে টাকা দেব।" কিন্তু আরবরা তাতে ভুলবে না। হিটলারের অত্যাচারের পূর্বেই ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে তাদের জাতীয় বাসভূমি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করেছিল, ব্রিটেনের কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। পরিকল্পনাটা উনবিংশ শতাব্দীর। সেই শতাব্দীর গোড়ায় নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের দিকে দিকে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত হয়। একদা যেমন সবাই ওরা খ্রীস্টান হয়েছিল এবার তেমনি ন্যাশনালিস্ট হয়ে যায়। এই যে নতুন ধর্ম—এ দাবী করে সকলের আনুগত্য। তুমি যদি জার্মানীতে বাস কর তবে তোমাকে জার্মান ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যদি রাশিয়াতে বাস কর তবে রাশিয়ান ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যদি পোলাণ্ডে বাস কর তবে পোলিশ ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যারা এতে নারাজ তারা দেশান্তরে গিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করে। কিন্তু ইহুদীরা যাবে কোথায়?

রাশিয়াতে ওরা খাপ খায় না, কিন্তু জার্মানীতেও কি খায়? জার্মানীতেও খাপ খায় না, কিন্তু ইংলণ্ডেও কি খায়! ইহুদী সংখ্যা অল্পস্বল্প হলে ইহুদীদের হজম করতে পারা যায়। কিন্তু ইহুদীরাই যে হজম হতে নারাজ। একসঙ্গে লাখে লাখে ইহুদী আশ্রয় নিতে এলে স্বদেশের লোক মারা যায়। চারদিকে ইহুদীবিদ্বেষ ছড়ায়। ইহুদীরা তা হলে করে কী? অগত্যা ওরাও চায় আলাদা একটি বাসভূমি পেতে। প্রথমে ওরা ভেবেছিল আফ্রিকায় বা অন্য কোথাও গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। কিন্তু পরে ওদের নেতারা বিধান দেন উপনিবেশ স্থাপন করার চেয়ে আদি বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যেমন একদল জায়নিস্ট হয়ে ওঠেন তেমনি আরেক দল তার অশুভ পরিণাম অনুমান করে স্বজাতিকে সতর্ক করে দেন যে আরবরা বাধা দেবে ও তাদের সঙ্গে বিরোধ পেকে উঠবে। যাদের সঙ্গে চিরকাল সম্প্রীতি তাদের সঙ্গে শত্রুতা সমীচীন নয়। কিন্তু জায়নিস্টরা তখন রাশিয়ায় জার্মানীতে ও পূর্ব ইউরোপে স্বজাতির অপমান দেখে এমন বিচলিত যে ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে ভাবতে সময় পান না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁদের এনে দেয় অভাবিত সুযোগ। ইংরেজরা তাঁদের কাছে যে উপকার পায় তার প্রত্যুপকার স্বরূপ প্যালেস্টাইনে একটি ন্যাশনাল হোমের প্রতিশ্রুতি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরবদেরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করলে ইংরেজ দেবে স্বরাজ। পরে যখন এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে তখন ইহুদীদের বলে, "প্যালেস্টাইনে নাশনাল হোম দেব বলেছি, তা বলে এমন কথা তো বলিনি যে প্যালেস্টাইনটাই হবে তোমাদের ন্যাশনাল হোম।" ইহুদীরা চটে যায়। তখন দেশটাকে অবিভক্ত রেখে দুই স্বতন্ত্র অংশকে অটোনেমি দেবার প্রস্তাব ফেঁসে যায়। মারামারি করে ইহুদীরা যে অংশটা পায় সেটার নাম রাখে ইসরায়েল। সেটা হয় স্বাধীন রাষ্ট্র। আর বাকীটা গ্রাস করে জর্ডান। প্যালেস্টাইন নামে আর কোনো রাজ্য থাকে না।

ঠিক এইরকম বিপদেই পড়তে হতো আমাদের, যদি না ইংরাজরা যাবার সময় দু'পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে যেত। প্যালেস্টাইনে সে কাজটি করা হয়নি। আরব ও ইহুদী ইংরেজের প্রস্থানের পর মারামারি কাড়াকাড়ি করে যে যা পারে দখল করে নিয়েছে। দখলের উপর দাঁড়িয়েছে তাদের স্বত্ব। স্বত্বের উপরে দখল নয়। সেই থেকে ইহুদীদের

মনে দুঃখ তারা তাদের দু'হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের সনাতন বাসভূমি প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করতে পারেনি, জেরুজালেমের পূর্বাংশ ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তেমনি গাজা থেকে। সিনাই, সেও তো তাদেরই হওয়া উচিত ছিল। সামনে বাইবেল খুলে রেখে দু' হাজার বছর ধরে যার ধ্যান করেছে তার কতক যে এখনো পরহস্তগত। বাইবেল যে চিরন্তন দলিল।

ছ' বছর আগে লড়াই করে তারা তাদের পূর্বপুরুষের পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। আরবরা বলেছে এটা অন্যায়। দুনিয়ার বহুদেশ বলেছে এটা অন্যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলেছে যার জমি তাকে ফেরৎ দাও। কিন্তু জমিটা কি আরবদের যে ওরা ফেরৎ পাবে? মোটে তো বারো শো বছর ওদের দখল। কই, ওর পেছনে দলিল কোথায়? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে ওরাও ইয়াকুবের বা জেকবের বংশধর? ওরাও অবশ্য ইব্রাহিমের বা এব্রাহামের উত্তরপুরুষ। কিন্তু ওদেরকে তো অন্য বাসভূমি দেওয়া হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে কে বলেছিল ওদের বারো শো বছর আগে আসতে? ওরাই অন্যায় করেছে। ইহুদীরা যেটা করেছে সেটার আধুনিক নাম লিবারেশন। এ লড়াই লিবারেশনের লড়াই।

আরবরা বলেছে অবিকল ওই কথা। এ লড়াই লিবারশনের লড়াই। ইহুদীরা ছলে বলে কৌশলে জায়গা জমি বাড়িয়ে নিতে চায়। সমগ্র প্যালেস্টাইনটাই আরবদের পাওনা ছিল। সমগ্র জেরুজালেমটাই ছিল তাদের পাওনা। তাদের পাওনার অধিকাংশ থেকে তারা বঞ্চিত হয় ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়। পরে আরো কতক অংশ থেকে। ছ' বছর আগে বাকীটার থেকে। তার উপরেও প্যালেস্টাইনের বাইরে সিরিয়া ও মিশরের কিছুটা ইসরায়েল বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার তো সুয়েজ খালের পশ্চিম পারেও ছিনতাই করেছে। ওদের লোভের কি সীমা আছে? বেশ তো ছিল ওরা ইউরোপে। কেন ওরা ফিরে এল এশিয়ায় ও আফ্রিকায়? ওদের নিয়ে এল কারা? টিকিয়ে রেখেছে কারা? জিতিয়ে দিচ্ছে কারা? তাদের সবাইকার বিরুদ্ধে এবার তৈলসংগ্রাম: এ সংগ্রাম চলছে, চলবে। এছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামও আবার শুরু হবে। আরবদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা সমগ্র প্যালেস্টাইনটাই উদ্ধার করতে চায়। যেমন ইহুদীদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা চায় সমগ্র পিতৃভূমি। সমগ্র জেরুজালেমটাই উভয় পক্ষের চরমপন্থীদের

চরম লক্ষ্য।

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্যে একটা ন্যাশনাল হোম হবে এ ঘোষণা ১৯১৭ সালের ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফুরের। এই ঘোষণায় প্যালেস্টাইনের অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্বস্বত্ব সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও ছিল। তা না হলে আরবরা প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করত না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল। তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও কি আরবরা ইংরেজদের সাহায্য করেনি? তারা কি জার্মানদের পক্ষে লড়েছে? কিন্তু প্রত্যেকবারই মহাযুদ্ধ শেষ হয় আর ইংরেজরা আরবদের অগ্রাধিকারটা উপেক্ষা করে। যেন ইহুদীদের জন্যেই তুরস্ককে হটানো। আরবদের জন্যে নয়। যেন ইহুদীদের জন্যেই নাৎসীদের ঠেকানো। আরবদের জন্যে নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের জনমত নির্যাতিত ইহুদীদের পুনর্বাসনের জন্যে ইসরায়েল ভিন্ন আর কোনো ঠাঁই খুঁজে পায় না। ইসরায়েলেই ওদের নতুন করে বসতে হবে। জার্মানীতে নয়, অস্ট্রিয়াতে নয়, হাঙ্গেরীতে নয়, বলকানে নয়। যেসব দেশে ওরা শত শত বৎসর ধরে বাস করছিল। রাশিয়ায় যারা ছিল তারা নির্যাতিত হয়ে থাকলে আক্রমণকারী নাৎসীদের দ্বারা হয়েছিল। রাশিয়ানদের দ্বারা নয়। তারা ইসরায়েল রাষ্ট্রে প্রস্থান করল না। পশ্চিম ইউরোপে যারা ছিল তারাও নাৎসী ভিন্ন কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়নি। তারাও জার্মানী ভিন্ন আর কোনো দেশ থেকে প্রস্থান করল না। আমেরিকায় তারা তো বরাবরই স্বাগত! সেখান থেকেও তারা প্রস্থান করল না। ব্যতিক্রম কেবল তারাই যারা ইহুদী রাষ্ট্রের উৎসাহী সমর্থক। নির্যাতিত নয়, আদর্শনিষ্ঠ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা যা পাচ্ছি তা এই যে ইসরায়েলের বীজ বোনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই। হিটলারের জন্মের পূর্বেই। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়েছিল ১৯১৭ সালেই। হিটলারের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই। হিটলারের অত্যাচার যতই বাড়তে থাকে ইসরায়েলের চারা গাছটি ততই বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে ইউরোপের মাটিতে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে তাকে রোপণ করা হয় আরব দেশের মাটিতে। ইহুদীদের ক্ষতিপূরণ ইউরোপীয়রা করবে না। করবে আরবরা। তার কারণ তারা বহু শতাব্দীকাল তুরস্কের সাম্রাজ্যে ও তার পরে ইংরেজ ফরাসীদের অভিভাবকতায় বাস করে ছত্রভঙ্গ ও দুর্বল। হতো যদি তারা হাজার বছর আগেকার মতো

দিগ্বিজয়ী তা হলে প্যালেস্টাইনের একাংশ ইহুদী রাষ্ট্র হতো না, বাকীটা জর্ডানের মধ্যে বিলীন হতো না। দশ লাখ আরব বাস্তুচ্যুত হতো না। এতদিনে তাদের সংখ্যা পনেরো লাখ হয়েছে। প্যালেস্টাইনে চিরকালই কতক ইহুদী ছিল। আরব জগতের সর্বত্র ইহুদীরা সহ-অবস্থান করত। ইহুদীরা তাদের শত্রু ছিল না। শত্রু হয়ে উঠল তাদের প্রভু হয়ে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রবর্তকরা প্রধানত পূর্ব ইউরোপে লালিত। তাঁদের গায়ে লেগেছিল সমাজতন্ত্রের বাতাস। অথচ পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয় সম্পর্ক। তাই গণতন্ত্রও তাঁদের কাম্য। দেখতে দেখতে ইসরায়েল হয়ে ওঠে ডেমোক্রাসী ও সোশিয়ালিজমের অন্যতম পীঠস্থান। ইহুদীরা দেশটাকে ধনধান্যে পুষ্পে ভরে দেয়। মরুভূমিতেও ফসল ফলায়, ফুল ফোটায়। আরবদের বড়ো বড়ো দেশগুলিতে যা হয় না ইহুদীদের ওইটুকু দেশে তা হয়। আরবদের যে কোনো দেশের চেয়ে ইসরায়েল আরো অগ্রসর, আরো উন্নত। এমন কি সামরিক বলেও বলবান। আন্তর্জাতিক সহানুভূতি তো ইসরায়েলের দিকে যাবেই।

কিন্তু দেখা গেল ইসরায়েলের মূলনীতি হলো দুনিয়ার সব ইহুদীর জন্যে দরজা খুলে রাখা। শুধু তাই নয়, তাদের ডেকে আনা। যাতে ম্যানপাওয়ার বাড়ে। এক কোটি ইহুদীকে যদি জায়গা দিতেই হয় তবে রাজ্যের সম্প্রসারণ ছাড়া গতি নেই। তাতে তাদের অনাগ্রহও নেই, কারণ ইসরায়েলের আশেপাশে প্রাচীনকালে ইহুদীদের বসত ছিল। যেখানে বসত ছিল না সেখানে দখল ছিল। পুরাতনের পুনরধিকার যদি জাতীয় নীতি হয় তবে ইসরায়েল রাষ্ট্র তার প্রতিবেশীদের তিষ্ঠতে দেবে না। আরবদের খেদিয়ে নিয়ে যাবে আরো উত্তরে আরো দক্ষিণে আরো পূর্বে। ইসরায়েলে যেসব আরব টিকে থাকবে তারা হবে নিম্নশ্রেণী। ইতিমধ্যেই তিনটি শ্রেণী হয়েছে। ইউরোপীয় ইহুদীরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। ওরিয়েন্টাল ইহুদীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আরবরা যারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে তারা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সোশিয়ালিজমও দেখা যাচ্ছে শ্রেণীশূন্য নয়। গাত্রবর্ণেরও তারতম্য আছে। এ এক নতুন বর্ণবিভাগ।

ইসরায়েলের সৃষ্টি যেভাবে হয়েছে সেটা আরবদের মেনে নেওয়া সহজ নয়। তবু সেটাও তাদের সহ্য হতো, যদি না অনবরত ম্যান পাওয়ার বাড়ানো ও পররাজ্য গ্রাস হতো ইসরায়েলের মূলনীতি। এই কিছুদিন আগেও যারা

নির্বাতিত ছিল তারাও বলদর্পী হিটলারের ভাষায় কথা বলছে। তাদের উচ্চাভিলাষ এখন আকাশস্পর্শী। তারা নাকি পারমাণবিক বোমা বানাবে ও সে বোমা কায়রো বাগদাদ আম্মান বেইরুট দামাস্কাসের উপর ফেলবে। তারা কি সুয়েজ খালকেই তাদের সীমান্ত করে দাঁড়ি টানবে? তারা কি ওর দুই পার দখল করে গোটা খালটাই নিজেদের করবে না? আরবরা ওদের বিশ্বাস করে না। সেইজন্যে সব বেদখল জায়গা ফেরৎ চায়। ইসরায়েলের সুমতি দেখলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাইবে তার বিতাড়িত আরব নাগরিকদের পুনর্বাসন। হয় ইসরায়েলের ভিতরে, নয় তার বাইরে নতুন এক রাজ্যে। এর জন্যে যতবার দরকার ততবার তারা লড়বে।

ইসরায়েল বরাবর বলে এসেছে সে চায় সরাসরি কথাবার্তা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও গোপন করেনি যে কতকগুলি দখলী জায়গা হাতছাড়া সে করবে না। তার নিরাপত্তার জন্যে হাতে রেখে দেবে। তা ছাড়া প্যালেস্টাইনের বিতাড়িত আরবদের সে ঘরে ফিরে নেবে না। আরব মাইনরিটিকে সে আর বাড়তে দেবে না। তাই যদি হয় তবে তার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালিয়ে এমন কী লাভ হবে? সুয়েজ খাল থেকে সে হয়তো দূরে সরে যাবে কিন্তু তার বিনিময়ে যা যা চাইবে তা দিতে গেলে তার কাছে কূটনৈতিক পরাজয় হয়। সামরিক পরাজয়ের পিঠে কূটনৈতিক পরাজয় চাপলে আরবদের পক্ষে সেটা দুর্বহ হতো, তাই তারা সরাসরি কথাবার্তার প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি।

তা বলে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় কথাবার্তা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। যতবার হয়েছে অচল অবস্থায় ঠেকেছে। কারণ ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম ছাড়বে না। সবটাই রাজা ডেভিডের রাজধানী। গোলান হাইটস ছাড়বে না, সেটা হাতে থাকলে সিরিয়ার দিক থেকে বিপদ আসবে না। শারম-এল শেখ ছাড়বে না, সেটা হাতে থাকলে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে। সবচেয়ে বড়ো কথা প্যালেস্টাইনের বিতাড়িত আরবদের সে ঘরে ঢুকতে দেবে না। অপর পক্ষে আরব দেশগুলি এসব প্রশ্নে অটল অনড়। ছ'বছর এইভাবে কেটে গেছে। আরো ছ'বছরও কাটতে পারে। তাতে ইসরায়েলের ক্ষতি নেই। যতই দিন যাবে ততই পাকা হবে তার দখল। পরে আরবদের দাবী তামাদি হবে যেমন তামাদি হয়েছে ১৯৪৮ সালের ইসরায়েলী দখলের উপর তাদের দাবী।

আরবরা কোনো কালে এর চেয়ে বেশী একজোট হয়নি, তবে তাদের এ জোট সর্বাঙ্গীণ ঐক্য নয়। এখনো তাদের মিলিটারি কমাণ্ড এক নয়। তাদের পররাষ্ট্রনীতি এক নয়। তাদের ফাইনান্স এক নয়, তাদের বাণিজ্যনীতি এক নয়। যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া সহজ, শেষ করা কঠিন। রুশ মার্কিন সহযোগিতায় যুদ্ধবিরতি না ঘটলে সাপের ছুঁচো গেলার মতো দশা হতো তাদের। আবার যুদ্ধ শুরু করার হুমকি তাদের মুখে সাজে না। সেটা বিপজ্জনকও। কারণ তারা হেরে যাচ্ছে দেখলে রাশিয়া তাদের অনুরোধ শুনে সেনা পাঠাবে। সঙ্গে সঙ্গে বেধে যাবে রুশ মার্কিন বিরোধ। সবাই মিলে থামিয়ে না দিলে বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়ে দিলেও শান্তি হবে না। আরবরা অশান্ত থেকে যাবে। তাদের তৈল সংগ্রামও আর কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। চাই এমন এটা ফরমুলা যেটা স্বস্তি পরিষদ একমত হয়ে গ্রহণ করতে পারবে। যেটা বর্জন করতে ইসরায়েল সাহস পাবে না। যেটা মেনে নিতে আরবরাও নারাজ হবে না। সেটার জন্যে সকলে রুশ মার্কিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হাতেই মরণ তাদের হাতেই বাঁচন।

পুনশ্চ :

পাঁচ বছর কেটে গেছে। সুয়েজ খাল খুলেছে, কিন্তু তেলের দাম কমেনি। বিলিতী পত্রিকার চাঁদা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে ষোল পাউণ্ড। মার্কিন মধ্যস্থতায় মিশর ও ইসরায়েল মিটমাটেও পন্থায় কিছুদূর এগিয়েছে, কিন্তু জেরুজালেম দূর অস্ত। স্বাধীন প্যালেস্টাইনও অনিশ্চিত।

ভারত চীন মৈত্রী

একালে পশ্চিম ইউরোপের যে গুরুত্ব সেকালে তার অনুরূপ গুরুত্ব ছিল মধ্য এশিয়ার। বেশীর ভাগ বাণিজ্য চলত স্থলপথে। স্থলপথের বড়ো বড়ো যতগুলো রাস্তা সব ক'টার মিলনভূমি ছিল মধ্য এশিয়া। সেইসব রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করত নানা দেশের ব্যবসায়ী। সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রী বা বিদ্যার্থী বা ধর্মপ্রচারক। যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত।

মধ্য এশিয়ার একদিকে চীন জাপান। আরেকদিকে ভারত, ইরান, আরব। আরো একদিকে সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম। চতুর্থ দিকটা জনবিরল বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া। যেমন ইউরোপের সঙ্গে তেমনি চীন জাপানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের প্রধান সূত্র ছিল মধ্য এশিয়া। বলা বাহুল্য, আরো একটা যোগসূত্র ছিল সমুদ্রবক্ষ। বাষ্পচালিত জাহাজের প্রবর্তন হলে সেইটেই হয় প্রধান যোগসূত্র। জলপথের সব ক'টা বড়ো বড়ো রাস্তা মিলিত হয় পশ্চিম ইউরোপে। মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব স্থানান্তরিত হয়।

মধ্য এশিয়া যখন মধ্যস্থ ছিল তখন চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল নিকটতর। এটা কেবল বাণিজ্যের বেলা নয়। সংস্কৃতির বেলাও। পরে বিভিন্ন কারণে চীন ও ভারত উভয়েই বাইরে যাওয়া ও বাইরের থেকে আসা বন্ধ করে দেয়। ভারতীয়দের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা পাপ। তার মানে জলপথ নিরাপদ নয়। তেমনি যবন সংস্পর্শ পাপ। তার মানে স্থলপথও বিপদসঙ্কুল। যে যার নিজের দেশে আবদ্ধ থাকলে মেলামেশা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। চীনের সঙ্গে যেটুকু মেলামেশা ঘটে সেটুকু তিব্বতের মধ্যস্থতার কল্যাণে।

তিব্বতের অবস্থান চীন ও ভারতের মাঝখানে। কিন্তু পথঘাট অতীব দুর্গম। তিব্বত নিজেই একটা মালভূমি। হিমালয়ের এপার থেকে যাঁরাই তিব্বত জয় করতে গেছেন তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন। কতক লোক যেত তীর্থ করতে মানস সরোবর ও কৈলাসে। কতক যেত ধর্ম প্রচার করতে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিতে। কতক যেত আমদানী রপ্তানী উপলক্ষে। চীনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত লাসায়। তিব্বতের শাসকরাও বাইরের লোকের আসা যাওয়ার উপর কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন। কাজেই, যেত আসত একমুঠো

লোক। যোগাযোগও সেই পরিমাণে ক্ষীণ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত থাকলে তিব্বতীরাই দলে দলে আসত। নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত বৌদ্ধ শিক্ষকদের।

তিব্বত কোনোকালেই হিন্দুশাসিত দেশ ছিল না, মুসলিম শাসিতও নয়। তার শাসককুল একদা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু জাতিতে তাঁরা তিব্বতীয়। তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভারতীয়ও নন, চৈনিকও নন। এই ভাবে বহু শতাব্দী অতীত হবার পর তাঁরা চীন সম্রাটদের ঊর্ধ্বতনত্ব মেনে নেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তিব্বত পরাধীন রাজ্য হলো। চীনের একজন প্রতিনিধি লাসায় এসে বাস করতেন। আর কোনো দেশের প্রতিনিধিকে ঢুকতে দেওয়া হতো না। এটা যার সূচক তার নাম সোভরেনটি নয় সুজরেনটি। তিব্বতীরা সোভরেনটি কাউকেই দেয়নি, অথচ তারা নিজেরাও যে সোভরেন তাও নয়। এটা একটা অরক্ষিত অবস্থা। ভারতের ব্রিটিশ কর্তারা যে এর সুযোগ নেবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? চীনের দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা তিব্বতী শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতান। তা বলে চীন সেটা স্বীকার করতে যাবে কেন? ম্যাকমেহন লাইন তিব্বত মেনে নিলেও চীন মেনে নেয়নি, দলিলে চীন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত স্বাক্ষর দেননি। ইংরেজরাও পীড়াপীড়ি করেনি।

কালচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজরা একদিন ভারত ছেড়ে চলে যায়। তার কিছুদিন পরে কমিউনিস্টরা চীনের মূল ভূমির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। গোড়ার দিকে ওরা তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমতা বা সোভরেনটি দাবি করেনি। তিব্বতকে বলেনি চীনের "তিব্বত অঞ্চল"। পরে কিন্তু তিব্বত সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের নীতিগত বিরোধ অনেক দূর গড়ায়। চীন সরকার সন্দেহ করেন যে তিব্বত সরকার তলে তলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত। আর চক্রান্তটা চলেছে ভারতের সীমান্ত পথ দিয়ে। তাই ভেবে চীন সরকার তিব্বতে সৈন্য পাঠান, পররাষ্ট্র নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও পরামর্শ দেবার জন্যে লাসায় নিজের লোক রাখেন। তিব্বত হয়ে যায় চীনের একটি অঞ্চল বা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। আরো পরে স্বায়ত্তশাসনও কুক্ষিগত হয়।

দালাই লামাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগেই তিনি পালিয়ে আসেন। এমন কোনো কথা ছিল না যে বৌদ্ধপ্রধান এতগুলো দেশ থাকতে ভারতই তাঁকে ও তাঁর মতো পলাতকদের আশ্রয় দেবে। এ কাজটি করা হয় ভারত বুদ্ধের

জন্মস্থান ও বৌদ্ধদের পুণ্যভূমি বলে। তবে অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, তিব্বত একটি ক্ষুদ্র দেশ, একটি স্বাধীন দেশ ও একটি ধর্মপ্রাণ দেশ, যার উপর গায়ের জোরে কমিউনিজম নামক ধর্মহীন বা ধর্মদ্রোহী তত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। তাঁরা তিব্বতীদের পক্ষ নেন, চীনের বিপক্ষে যান। এতে ভারত সরকার পড়ে যান বেকায়দায়। চীনের লোক কমিউনিস্ট হবে কি হবে না সেটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তেমনি তিব্বতকে চীন কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেবে সেটাও চীনের ঘরোয়া ব্যাপার। গোড়ায় ভারত চীনের সঙ্গে তর্ক করেছিল এই বলে যে চীন তিব্বতের উপর সুজরেনটি দাবী করতে পারে, সোভরেনটি দাবী করতে পারে না। কিন্তু চীন সে যুক্তি অগ্রাহ্য করে। ভারতও তাতে সায় দেয়।

পরবর্তীকালে যে সংঘর্ষটা ঘটে তার ইস্যু তিব্বত নয়, সীমান্ত রেখা। ঘটিতকে আর অঘটিত করতে পারা যাবে না! ভারত ঠিক না চীন ঠিক এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত নিয়ে মতভেদ এখনো অমীমাংসিত। ম্যাকমেহন লাইন চীন মেনে নেয়নি। ভারতও তার দাবী ছাড়েনি। আক্সাই চীন সম্বন্ধেও একই রকম অবস্থা। দুই পক্ষেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে দুই পারে বসে আছে। কেউ একতরফা সরিয়ে নেবে না। চাই একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। তার কত দেরি আছে কে জানে!

তবে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য কোনোদিন পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের পরের ধাপ কথাবার্তা নতুন করে শুরু করা। উভয় পক্ষে শুভেচ্ছা থাকলে মিটমাট একদিন না একদিন হবেই। প্রশ্নগুলো মীমাংসার অতীত নয়। তবে আমাদের একটা অতি পুরাতন ধারণা বরাবরের মতো ত্যাগ করতে হবে। সে ধারণাটা এই যে তিব্বত একটা স্বাধীন দেশ, একটা মধ্যবর্তী দেশ, একটা বাফার স্টেট। এ ধারণা ত্যাগ না করলে চীনের সঙ্গে মিটমাট হবার নয়। তা যদি না হয় তবে চীনও ভুটান, সিকিম প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র বা রাজ্যের ব্যাপারে ভারতের বিপরীত নীতি অবলম্বন করবে।

সে যাই হোক, তিব্বত সেকালের মধ্য এশিয়া নয়। সেকালের মধ্য এশিয়ার মতো আন্তর্জাতিক চৌরাস্তা নয়। সেকালের মধ্য এশিয়ার মতো একটি চৌরাস্তা হচ্ছে একালের পশ্চিম ইউরোপ। সেখানেই চীনের সঙ্গে ভারতের মেলামেশার অবাধ সুযোগ জুটবে। ততদূর যারা যাবে না তাদের

জন্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর আর হংকং। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রভাষা চারটি। ইংরেজী, চীনা, মালয় ও তামিল। সেখানকার চীনাদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিশেষ সদ্ভাব। আর হংকং তো সকলের কাছেই খোলা। যেমন চীনাদের কাছে তেমনি ভারতীয়দের কাছে। তেমনি জাপানীদের কাছে। ইংরেজদের তো কথাই নেই। মেলামেশার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল স্থান হচ্ছে হংকং। চীনের ভিতরের খবর সেখানে বসেই পাওয়া সহজ। আর সেখানকার সংস্কৃতিও চীনা সংস্কৃতি।

তিব্বত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার জন্যে বেদনাবোধ স্বাভাবিক। কিন্তু তার নাগরিকদের বিপদে আপদে আশ্রয় দেওয়া এক কথা, আর তারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এই স্বীকৃতি দেওয়া অন্য কথা। এমনতর স্বীকৃতি এখনপর্যন্ত অপর কোন রাষ্ট্র দেয়নি। এমন কি চীনের পরম শত্রু তাইওয়ানও না। এই প্রশ্নে কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্ট একমত আমরাই যদি তিব্বতের একমাত্র রক্ষক হই তবে সকলেই ভাববে যে আমাদের নিশ্চয়ই একটা গোপনীয় অভিসন্ধি আছে। সেটা তিব্বতের স্বার্থে নয়, আত্মস্বার্থে। দুনিয়ায় আত্মস্বার্থ কার নেই? কিন্তু যাদের তেমন স্বার্থ আছে তারা যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে তোড়জোড় করে, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি পাতায়, সামরিক চুক্তিপত্রে সই করে। অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির ফলে বিদেশের মাটিতে লড়বার জন্যে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য থাকে। এর নাম গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা নয়।

কাগজে কলমে না হলেও কার্যত চীন ম্যাকমেহন লাইন মেনে নিয়েছে। নইলে নেফা থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যেত না। সেটা যে চাপে পড়ে করেছিল তা নয়। করেছিল স্বেচ্ছায়। উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে জানান দেওয়া যে আইন অনুসারে এলাকাটা চীনদেশের তিব্বত অঞ্চলের সামিল। কারণ ম্যাকমেহন লাইন চীনের লিখিত সম্মতি পায়নি। আমার মনে হয় ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে চীন আর ভারতকে ঘাঁটাবে না ভারত যদি আকসাই চীন নিয়ে চীনকে আর না ঘাঁটায়। দুই প্রান্তেই স্থিতাবস্থা বলবৎ থাকবে। দুই পক্ষ যখন স্থিতাবস্থায় বিশ্বাস রাখতে পারবে তখন ধাপে ধাপে সীমান্ত থেকে সৈন্য সামন্ত সরাতেও পারবে। চাই পরস্পরের উপর বিশ্বাস।

চীন ও ভারত কোনদিনই অহি-নকুল ছিল না। প্রবল পরাক্রান্ত চীন সম্রাটরাও ভারত আক্রমণের কথা চিন্তা করেন নি। ভারতের গৌরবের যুগে

ভারত পাঠিয়েছিল ধর্মপ্রচারক ও সংস্কৃতির বাহক। বাণিজ্যপোতও যাতায়াত করত। কিন্তু এমন কোন স্বার্থের বিরোধ ছিল না যার জন্যে যুদ্ধে নামতে হতো। তা হলে আজকের দিনে হঠাৎ এই দুই প্রাচীন দেশ সংঘর্ষের পথ ধরতে গেল কেন? হেতুটা কি কমিউনিজম প্রচার বনাম কমিউনিজম নিরোধ? কারো কারো মতে বিরোধের হেতু মতবাদঘটিত। তা হলে তো রুশ-চীন ভাই ভাই হতো। পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার শানাত না। চীন হাজার চেষ্টা করলেও ভারতকে পুরোপুরি গ্রাস করতে বা লাল করতে পারত না। সেটা কতক লোকের কষ্টকল্পনা। ভারতও যে কমিউনিজমের ঘোরতর শত্রু তাও নয়। প্রমাণ রাশিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুসম্পর্ক সম্ভব ও সঙ্গত।

পুনশ্চ:

চীনের উপর চাপ দিয়ে নয়, চীনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিব্বতকে তার অটোনমি ফিরিয়ে দিতে রাজী করানোই হবে উভয়ের প্রতি ভারতের বন্ধুকৃত্য। অটোনমি ফিরে পেয়ে তিব্বত স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট হতে পারে। লামাতন্ত্রের যুগ ফুরিয়েছে।

মার্কিন স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী

মার্কিন স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী প্রসঙ্গে লেখার অভিপ্রায় ছিল এক বছর আগে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারা গেল না। ইতিমধ্যে আমার চিন্তা আরো পরিষ্কার হয়েছে। বিলম্বের সুফল এই। আদৌ না লেখার চেয়ে দেরিতে লেখাও ভালো।

আমার ছেলেবেলায় আমার হাতে একখানি বই পড়ে। তাতে ছিল আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস। বোঝবার মতো বয়স তখনো হয়নি। তবে মোদ্দা কথাটা এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে ছিল আমেরিকা, অপর প্রান্তে ভারত। আমেরিকা যদি স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হতে পেরে থাকে ভারতই বা হতে পারবে না কেন? একদিন আমার বাবা আমাকে অযাচিতভাবে বলেন, "তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন।" আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাস ছিল না। তবে দেশকে স্বাধীন করতে হবে একথা যখনি মনে উদয় হতো তখনি আমেরিকার কথা ও জর্জ ওয়াশিংটনের কথাও সঙ্গে সঙ্গে উদয় হতো। আমাদের নেতারা যখন আমেরিকার মতো কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন তো অর্ধেকটা কাজই করা হয়ে গেছে। বাকি থাকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও সশস্ত্র সংগ্রাম।

মহাত্মা গান্ধী তখনো ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। রাজনৈতিক চিন্তাধারা তখনকার দিনে দুটি স্রোতেই প্রবাহিত হতো। একটি তো সশস্ত্র সংগ্রাম। অপরটি আইনসম্মত আন্দোলন। আমার চোখে আইনসম্মত আন্দোলনের তেমন কোনো জাদু ছিল না। ওটা বুড়োদেরই সাজে। কিন্তু মহাত্মার আবির্ভাবের পর তাঁর প্রবর্তিত অসহযোগ ও গণ-সত্যাগ্রহ আমাকেও দোলা দেয়। ওটা সশস্ত্র সংগ্রাম না হলেও তার নৈতিক বিকল্প। তাতেও যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যায়। সুতরাং ওটা কেবল বুড়োদের জন্যে নয়, তরুণদের জন্যেও। কেবল সৈনিকদের জন্য নয়, জনগণের জন্যেও। আমার মন ক্রমশ গান্ধীপন্থার দিকেই আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনকে আমি দূর থেকে প্রণাম করি, কিন্তু তাঁর পন্থা আর আমার পন্থা বা আমার দেশের পন্থা হয় না।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমার সমবয়সীদের মধ্যে এমন এক-জনকেও পাইনি যিনি চতুর্থ একটা পন্থায় দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন। হাঁ, বিপ্লব চাই, সে বিপ্লব হবে রাশিয়ার মতো বিপ্লব কিন্তু তার সময় এখন নয়, তার আগে চাই স্বাধীনতা। তা সে অহিংস বা সহিংস যেভাবেই হোক। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র, আমেরিকা বনাম রাশিয়া, এই বৈপরীত্যবোধ আসে আরো একদশক বাদে। যখন গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ অনেকের মতে ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধী যেহেতু ব্যর্থ লেনিন সেহেতু অব্যর্থ। আমিও এঁদের মতোই ভাবতুম। কিন্তু স্টালিনের কার্যকলাপ আমাকে হতাশ করে। বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল না করে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। যাঁরা প্রাণে বাঁচবেন তাঁরা কর্তার ইচ্ছায় নাচবেন। লেনিনের পর স্টালিন যদি হয় বিপ্লবের অনিবার্য পরিণাম তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। তা হলে আমার সামনে বিকল্পটা কী? বিপ্লব ওই গান্ধীপন্থা। বার বার ব্যর্থ হলেও সেই পন্থাই শ্রেষ্ঠ, এ প্রতীতি আমার অন্তরে দৃঢ়প্রবিষ্ট হয়।

আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়ের দিক থেকে আমার মন ফিরে আসে স্বদেশে। কিন্তু আমি গোঁড়া জাতীয়তাবাদী হতে পারিনে। গান্ধীজীও আমেরিকার থোরো আর রাশিয়ার টলস্টয়ের কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন। আর ইংলণ্ডের রাস্‌কিনের কাছে। যাকে আমরা গান্ধীবাদ বলে থাকি তার তিন পোয়া হচ্ছে থোরোবাদ, টলস্টয়বাদ ও রাসকিনবাদ। এঁদের গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করেছি। গান্ধীজীর মধ্যেই এঁরা পেয়েছেন এঁদের উত্তরসাধক বা উত্তরাধিকারী। তা বলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এঁদের উত্তরসাধক বা উত্তরাধিকারী নয়। গান্ধীজীকেও তারা একমাত্র গুরু বা পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করেনি। যারা করেছে তারাও করেছে দেশের স্বাধীনতার গরজে। স্বাধীনতার পরে গান্ধীজীর আর সে গুরুত্ব থাকে না। সহকর্মীরাই তাঁকে ছাড়েন। তাঁর আশ্রয় হয় রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী, "একলা চল রে।" তেমন একলা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ছিলেন না। আততায়ী এসে হত্যা না করলে তাঁর নিঃসঙ্গতা তাঁর পক্ষে অসহনীয় হতো।

এখন আমেরিকার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমেরিকা বলতে যাঁরা বোঝেন রাশিয়ার ঠিক বিপরীত মেরু, ধনতন্ত্রের মেরুদণ্ড, আমি তাঁদের এক-জন নই। কারণ আমেরিকার স্বাধীনতার সংকল্পের মধ্যে বা সংবিধানের মধ্যে এমন কোনো মন্ত্র ছিল না যা কেবলমাত্র ধনিকদের বা ধনতন্ত্রীদের স্বার্থ সিদ্ধ

করত বা চিরকাল করবে। লাইফ, লিবার্টি অ্যাণ্ড পারস্যুট অব হ্যাপিনেস কি ভারতেও সর্বসাধারণের অভীষ্ট নয়? এমন ভারতীয় কে আছে যে লাইফ চায় না, লিবার্টি চায় না, পারস্যুট অব হ্যাপিনেস চায় না? ভোট দিতে বললে সকলেই এই তিনটির পক্ষে ভোট দেবে। সমাজতন্ত্র যাঁরা কাম্য মনে করেন তাঁরা যদি ব্যাপারটাকে ভোটের উপর ছেড়ে দেন তা হলে দেখবেন বেশির ভাগ ভোট এই তিনটির পক্ষেই পড়বে। যদি বন্দুকের নলের উপর ছেড়ে দেন তা হলে অবশ্য অন্য কথা। রাশিয়া বার বার আক্রান্ত হয়েছে, আমেরিকা কোনদিন আক্রান্ত হয়নি। যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্যে আমেরিকানরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তারা যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। তেমনি তাদের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতাও তাদের কাছে সমান প্রিয়। তাদের সংবিধানই তাদের সনদ। তার জন্যেও তারা যে-কোনো দাম দিতে তৈরি। সংবিধানকে কোনো একজন ডিকটেটর বা কোনো একদল ডিকটেটরশিপবিশ্বাসীর হাত থেকে রক্ষা করতেও তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই একজন বা একদল যদি ধনতন্ত্রী হয়ে থাকেন তা হলেও তাদের একই প্রতিজ্ঞা। ধনতন্ত্র ততদূর পর্যন্ত তারা মানবে যতদূর পর্যন্ত তা গণতন্ত্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে। গণতন্ত্রের সঙ্গে পায়ে পা মিলছে না দেখলে তারা গণতন্ত্রকেই রাখবে, ধনতন্ত্রকে ছাড়বে।

কিন্তু তার কোনো নিকট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কৃষক আর শ্রমিক এই দুই শ্রেণীই এখন ধনতন্ত্রের থেকে লাভবান হচ্ছে। ওদের বোঝানো শক্ত যে সমাজতন্ত্র থেকে ওদের লাভ আরো বেশি হবে। সমাজতন্ত্রের যেটা সত্যিকার আবেদন সেটা হলো সাম্যের আবেদন। সাম্য কি কৃষকরা চায়, না শ্রমিকরা চায়? তারা চায় আরো সমৃদ্ধি, আরো উন্নত জীবনমান। তাদের চেয়ে অবনত বা পশ্চাৎপদের সঙ্গে সমান হতে কি একজনও চায়? উপরে তুলে সমান করাও কষ্টসাপেক্ষ। সে কষ্ট বড়ো সামান্য কষ্ট নয়। তার জন্যে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ ত্যাগস্বীকার করে সেকথা আলাদা। কিন্তু তার জন্যে জোর জুলুম করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। একবার বেধেছিল। তার ভয়াবহ স্মৃতি আমেরিকানদের মনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয়বার গৃহযুদ্ধ সাধ করে কেউ ডেকে আনবে না। তবে ধনতন্ত্র যদি কখনো ভেঙে পড়ে সে কথা আলাদা। সেরকম একটা দুর্ভাবনা যে নেই তা নয়। দুর্ভাবনার শরিক কৃষক ও শ্রমিকরাও।

কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও অধিকাংশ আমেরিকান গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ত্যাগ করবে না। জোর করে কেড়ে নিতে গেলে বিদ্রোহী হবে। গণতন্ত্র ও মৌল অধিকার ওদের অস্থিমজ্জায়। সমাজতন্ত্র যাঁরা প্রবর্তন করতে চান তাঁদের কর্তব্য হবে ভোটের মাধ্যমে সেটাকে সম্ভব করা। বন্দুকের নলের মাধ্যমে নয়। এমন দিন কোনোদিনই আসবে না যেদিন আমেরিকানরা ভোটের রায় না মেনে গুঁতোর রায় মেনে নেবে। ধনতন্ত্রীরাও এটা জানেন। সেইজন্যে ফাসিজম সেদেশে পায়ের তলায় মাটি পায় না। রুশ কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে যখনি কোনো কোনো সংস্থা ফাসিজম প্রচার করেছে তখনি জনমত তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে।

আমেরিকার সংবিধান শাসনবিভাগকে একচ্ছত্র করেনি। সমান শক্তিশালী করেছে বিচারবিভাগকে ও বিধানবিভাগকে। একজিকিউটিভ, জুডিসিয়ারি ও লেজিসলেটিভ পরস্পর-স্বতন্ত্র। অথচ পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। এই অতুলনীয় ব্যবস্থা এক দশক বা দুই দশক ধরে নয়, দুই শতাব্দী ধরে স্থায়ী হয়েছে। ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড। একে বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রী বলে খাটোও করা যায় না। বুর্জোয়া রাষ্ট্র কি দুনিয়ায় ওই একটি আছে? ধনতন্ত্রী দেশ কি ওই একটিমাত্র? আরো গভীরে যেতে হবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যাঁরা আদি পুরুষ তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু পূর্ব হতেই মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন তাঁরা কী ধরনের রাষ্ট্র পত্তন করতে চান। তাঁদের পড়াশুনা ছিল প্রচুর। বিচার বিবেচনাও ভাবাবেগবর্জিত। একবার ইংরেজকে হটাতে পারলেই আর সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে এ ধরনের মনোবৃত্তি তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা একটি পাহাড়ের উপর ভিৎ পেতেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁদের রাষ্ট্র একটি দুর্গ। সবরকম ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁদের উত্তর পুরুষ তাঁদের নির্মিত দুর্গকে দুই শতাব্দী ধরে অক্ষয় বটের মতো রক্ষা করে এসেছে। দুনিয়ায় কিছুই নিখুঁত নয়, খুঁত ধরতে চাইলে যথেষ্ট খুঁত পাওয়া যায়। আমেরিকানরা নিজেরাই নিজেদের কঠোর সমালোচক। কিন্তু সমালোচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত যুগোচিত সংশোধন। সমূলে বিনাশ নয়। সমূলে বিনাশ মার্কিন জনমত সহ্য করবে না। কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে লাইফ, লিবার্টি তথা পারস্যুট অব হ্যাপিনেস যদি জাতীয় লক্ষ্য হয় তবে তারা সংশোধনের পথেই সেখানে পৌঁছবে। বিপ্লবের পথে নয়।

যুক্তরাষ্ট্র যাঁদের হাতে গড়া তাঁদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ বিবেকের দ্বারা

চালিত হয়ে দেশত্যাগ করে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে বন কেটে বসত করেছিলেন। ইচ্ছা করলেই তাঁরা ভোটের জোরে প্রোটেস্টান্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ সেই ক্যাথলিকদেরও তাঁরা সমান অধিকার দিয়ে নেশন গঠন করেন। যুক্তরাষ্ট্র হয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পৃথিবীতে প্রথম। নানা ধর্মের লোক সেদেশে শরণার্থী হয়ে গেছে, পরে স্বাধিকারসচেতন মার্কিন নাগরিক হয়েছে। ধর্মের জন্যে কেউ অবাঞ্ছিত নয়, সন্ত্রস্ত নয়, বিতাড়িত নয়। মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে কত বড়ো প্রগতিশীল পদক্ষেপ! এমন কী, বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সঙ্গেও। যেখানে ইহুদীদের গণহত্যা হতো। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র না হলে আর কোন্ দেশ পার্লামেণ্ট অব রিলিজনস্ ডাকত ও স্বামী বিবেকানন্দকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাত?

সবার নিচে সবার পিছে

সকালবেলা আমার ট্রেন। আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন আমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। যাঁদের আমি অতিথি। বন্ধুর মা থাকতেন আলাদা একটি ঘরে। আমাকে বিদায় দেবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে ঢিপ করে প্রণাম করি। তিনি আঁতকে উঠে বলেন, "আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শুদ্দুরটা আমাকে ছুঁয়ে দিল!"

বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেই সকালে আরো একবার স্নান করতে হবে। আমারই তো ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা। লাথি খেয়ে যেমন সাহেবকে বলতে হয়, "সার, পায়ে লাগেনি তো!" আমি আর বাক্যব্যয় না করে গাড়িতে গিয়ে বসি। কী হয়েছে কাউকে জানতে দিইনে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী শুনলে ব্যথা পেতেন। তাঁরা দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত। ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। তাঁদের কী দোষ! না, বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণীকেও আমি দোষ দিইনে। বুদ্ধিমতী হলে তিনি মুখ ফুটে ওকথা বলতেন না। আমার প্রস্থানের পর দ্বিতীয়বার স্নান করে শুদ্ধ হতেন। না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না। হাজার হাজার বছরের সংস্কার।

ঘটনাটা ঘটে স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে। ততদিনে নতুন সংবিধান তৈরি হয়ে গেছে। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে। তার জন্য শাস্তির বিধান আছে। মনুর বিধান উল্টে দিয়েছে নব্য মনুসংহিতা। কিন্তু সেসব তো শুধু কাগজে কলমে। সংবিধানের একটা বাংলা অনুবাদ হয়েছিল শুনেছি। সেটা নাকি ছাপা হয়েছিল দেবনাগরী লিপিতে। যাদের জন্য সংবিধান তারা জানতেই পায়নি সংবিধান তাদের কী কী অধিকার দিয়েছে। কী কী তাদের জন্মস্বত্ব! দেশে সংবাদপত্রের অভাব ছিল না। কোথাও জনগণের স্বার্থে তাদের জ্ঞাতব্য ধারাগুলি পরিবেশিত হতে দেখিনি।

এমন যে দেশ সে দেশে জনগণের একটি বৃহৎ অংশ ত্রিশবছর পরেও সংস্কারবদ্ধ সংরক্ষণশীল উচ্চতর বর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া বিচিত্র নয়। তা বলে এটা কি কেউ কখনো কল্পনা করতে পেরেছে যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মানুষদের পাইকারিভাবে পুড়িয়ে মারা হবে? এখন

পর্যন্ত আমরা শুনতে পাইনি যে নিহতদের মধ্যে স্পৃশ্যরাও ছিল। তা যদি হত তবে বলতে পারা যেত ওটা বর্ণভেদমূলক নয়, ওর মূলে অর্থনীতি।

সব অনর্থের মূলেই অর্থ, এটা একটা অত্যাধুনিক আবিষ্কার নয়। শাস্ত্রেই তো লিখেছে অর্থমনর্থম্। সুতরাং অস্পৃশ্যদেরও নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আর্থিক দাবিদাওয়া থাকতে পারে, যেটা শুনলে স্পৃশ্য জোতদার বা মহাজনদের পিত্ত জ্বলে যায়। তা বলে পুড়িয়ে মারা! সেটা কি সম্ভবপর, যদি তারা অস্পৃশ্য না হয়ে স্পৃশ্য হয়? অর্থনীতির আলোয় অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে বোঝাতে পারেননি বিত্তহীন ভূমিহীন হিন্দুদের কেন পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তু ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়। এখানে অর্থনীতি পরাস্ত। এই ধাঁধার উত্তর অর্থনীতিশাস্ত্রে নেই। এর উত্তর হিন্দুদেরও ভোট আছে আর সে ভোট তারা গোঁড়া মুসলমানদের না দিয়ে উদার মুসলমানদের দেবে, ফলে গোঁড়ার দল হেরে যাবে ও ক্ষমতা খোয়াবে। হিন্দুরা পালিয়ে এলে গোঁড়াদেরই জয়জয়কার। গোঁড়ারা যেদিন বুঝবে যে হিন্দুদের ভোট নেই কিংবা থাকলেও সে ভোট তাদের বিপক্ষে পড়বে না সেদিন তারা হয়তো বিত্তহীন ভূমিহীন হিন্দুকে টিঁকতে দেবে।

উপরে যেটা দিলুম সেটা একটা উদাহরণ। এক্ষেত্রে হয়তো সেটা প্রযোজ্য নয়। পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিলে জমি চাষ করবার জন্যে মুসলমান পাওয়া যায়, এতই তাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ভারত থেকে অস্পৃশ্যদের তাড়িয়ে দিলে জমি হবে পোড়ো জমি। স্পৃশ্যদের যদি চষতে বলা হয় ওরা হাঁকবে চড়া মজুরি। তা হলে ঘুরে ফিরে আবার অর্থনীতিতেই এর ব্যাখ্যা খুঁজতে হল। স্পৃশ্যরা সস্তা নয়, অস্পৃশ্যরা সস্তা। অস্পৃশ্যতা দূর হলে ওরাও স্পৃশ্য হবে, সুতরাং ওরাও আক্রা হবে। কলোনিয়াল ইকনমিতে চীপ লেবারের যে স্থান ফিউডাল ইকনমিতেও চীপ লেবারের সেই স্থান। তফাৎটা এইখানে যে গ্রাম দেশে চীপ লেবার বলতে বোঝায় ভূমিহীন চাষী আর তাদের মধ্যে একেবারেই নিঃস্ব অস্পৃশ্য দিনমজুর। অস্পৃশ্য বলেই তারা নিঃস্ব, না নিঃস্ব বলেই তারা অস্পৃশ্য, এটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আমি বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদ্ নই। আমার পক্ষে এটা অনধিকারচর্চা। তবু বলে রাখি যে আমার মতে অস্পৃশ্যরা হচ্ছে তাদের বংশধর আর্য আগন্তুকরা যাদের বলতেন দস্যু বা দাস। তাদের কতক অবশ্য প্রমোশন পেয়ে আর্যদের সমাজ সংগঠনে শূদ্র ও আবার প্রমোশন পেয়ে

সৎ শূদ্র হয়েছে। তারা স্পৃশ্য। তারা জল-চল। তা হলেও তারা "শূদ্দুর"। তারা "ট্যা"।

বিয়ের সময় বা শ্রাদ্ধের সময় উচ্চারণ করতে হয় "অমুকচন্দ্র ঘোষদাসস্য পুত্রঃ"। মহিলা হলে "শ্রীমতী অমুকা দাসী"। এর একটা ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত "রানী হর্ষমুখী দাসী"। পাইকপাড়া রাজবংশ। রানী হলেও দাসী। অভিজাত কায়স্থ পরিবারের মহিলারাও সরকারী কাগজপত্রে "দাসী" বলে পরিচিত ছিলেন। পরে কেউ কেউ সাহস করে "দেবী" হন। যেমন শ্রীমতী রাধারানী দেবী। কিন্তু অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজের ধারা অনুসরণ করে "রায়," "চৌধুরী," "ঘোষ", "বসু" ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করেন। এটা একটা সুদূর প্রসারী পরিবর্তন। আজকাল গ্রাম অঞ্চল থেকে যারা কলকাতায় গৃহস্থালীর কাজ করতে আসে তাদের নাম ও পদবী "রতনবালা বৈদ্য" বা "পূর্ণিমা মালী" যার স্বামীর পদবী "দাস" সেও বলবে তার নাম "সুভদ্রা দাস"। পতির পদবীতে সতীর পদবী, এটা বিলিতি কেতা। প্রথমে এটা আসে দেশীয় খ্রীস্টান সমাজে, তারপরে ব্রাহ্মসমাজে, তারপরে হিন্দু সমাজে। এখন তো মুসলমান সমাজেও দেখছি। যেমন "বেগম বদরুন্নিসা আহমদ।" সবচেয়ে চমৎকার "মণিকা রহমান বন্দোপাধ্যায়"। ইংরেজরা পরোক্ষভাবে নারীকে মুক্তি দিয়ে গেছে, বিশেষত শূদ্রাণীকে। নইলে এখানো সেই "গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী"র অনুবৃত্তি চলত।

মানবিক মর্যাদাকে পদদলিত করে সামাজিক প্রগতি হতে পারে না। যে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত না হয়ে বর্ণবিভক্ত বা জাতিবিভক্ত তাকে সর্বপ্রথমে শ্রেণীশূন্য না করে বর্ণশূন্য বা জাতিশূন্য করতে হবে। তার পরের অধ্যায় শ্রেণীশূন্যতা। প্রথম কাজটি প্রথমে। তাতে কিন্তু বিপ্লবের উন্মাদনা নেই। ইতিহাসে লেখা হবে না যে অমুক সালের অমুক মাসে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। অথচ এটাও কি একপ্রকার বিপ্লব নয়? চার পাঁচ হাজার বছরের 'দাস' বংশীয়দের দাস্যতা বিমোচন। যারা এতদূর এগিয়েছে তারা আরো অনেকদূর এগোবে। চারশো বছর আগে ইংলণ্ডের প্রোটেস্টান্টদেরও তো পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যে আগুনে তাদের পুড়িয়ে মারা হয় সেই আগুনই পুড়িয়ে খাক্ করে দেয় সে দেশের সনাতন ব্যবস্থা। আজকের ভারতে যারা আগুনে পুড়ে মরছে কালকের ভারতে তাদেরই বংশধররা সমাজের চূড়ায় বসবে। এই পরিবর্তনটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে

হয়। নয়তো কী হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জার্মানীর ইতিহাসে।

আমার বরাবর আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীনতার পর সতীদাহ আবার ফিরে আসবে। সেটা যে এখনো ফিরে আসেনি এর জন্যে ইতিহাসবিধাতাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এটাও তো একপ্রকার দাহ। আইন আদালতের সাহায্যে একে দমন করতে হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। একে নিবারণ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে। যারা সবার নিচে তাদের টেনে তুলতে হবে, যারা সবার পিছে তাদের এগিয়ে দিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে শুনেছিলুম মহাত্মা গান্ধী নাকি বলেছিলেন যে হরিজনদের প্রতি যদি সুবিচার না হয় তবে আর পঁচিশ বছরের মধ্যেই হিন্দুসমাজ ভেঙে যাবে। তিনি ছিলেন হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী। তাই 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের জন্যে আবেদন-নিবেদন করেছিলেন। আবেদন-নিবেদনে ফল হচ্ছে না দেখে শেষের দিকে তিনি 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতে অনশন করার কথাও ভাবছিলেন। সেটাই হতো তাঁর জীবনের শেষ অনশন। তার আগেই বেধে যায় দিল্লীর মুসলমানদের উপর সশস্ত্র হিন্দুদের হামলা। সেটা বন্ধ করতে নতুন সরকারের অক্ষমতা ও কারো কারো অনিচ্ছা উপলব্ধি করে তিনি সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতেই তাঁর জীবনের শেষ অনশন আরম্ভ করেন। অনশনভঙ্গের অল্পদিনের মধ্যেই সশস্ত্র হিন্দুর হাতে নিধন। তাই 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতে শেষ অনশন আর সম্ভব হল না। কিন্তু কথাটা ঘুরছিল তাঁর মাথায়। আন্দোলনটাকে আবেদন-নিবেদনের স্তর থেকে আরো এক ধাপ উপরে তোলার প্রয়োজন ছিল। ত্রিশ বছর আগে।

আজ ত্রিশ বছর বাদে একথা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও চিন্তা করছেন। সরকারের কর্তব্য যদি সরকার না করতে পারেন, অক্ষমতার আড়ালে যদি কারো কারো অনিচ্ছা থাকে, তা হলে আবেদন নিবেদন করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। কারণ এই ইস্যুতে হিন্দুসমাজে ভাঙন ধরবে। আর এ দেশের শতকরা পঁচাশিজনই-তো হিন্দু। তবে আমার মতো লোকের বেদনাটা হিন্দুসমাজের মুখ চেয়ে নয়। মানবজাতির মুখ চেয়ে। একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে জার্মানীতে ও পোলাণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্যাস

চেম্বারে দগ্ধ করে হত্যা করেছিল এটা মানবমাত্রেরই মুখে কালি। এখানে ইহুদী খ্রীস্টান হিন্দুসমাজের প্রশ্ন ওঠে না। দক্ষিণ ভারতের নরমেধযজ্ঞ ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এমন ভাবে অভিভূত করে যে তিনি কলম হাতে নিয়ে নাটক লিখে ফেলেন, সে নাটক অভিনয়ও করান। আমিও ছি... নাটকের একজন দর্শক। ধীরেন্দ্রনাথ গান্ধীপন্থী নন, মার্কসপন্থী। অথচ তিনিই হলেন অগ্রণী। গান্ধীপন্থীরা তখন কোথায়? বিনোবাজী অনশন করতেন গো-হত্যা নিবারণের জন্যে, হরিজনহত্যার প্রতিকারের জন্য নয়।

কিন্তু কেউ যেন এর মধ্যে রাজনীতি নিয়ে না আসেন। আনলে আন্দোলনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। বর্ণযুদ্ধ বা শ্রেণীসংগ্রাম আমরা চাইনে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও সেটাকে অহিংস রাখতে পারবেন না। অনশনের শক্তি বিধাতা সবাইকে দেননি। আর অনশনও যে একটা শক্তি এটা ব্যক্তির বেলা হলেও সমষ্টির বেলা নয়। তাতে দশ কোটি হরিজনের শক্তি বৃদ্ধি হবে... তাদের আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার রক্ষা করতে শেখানো হোক।